চতুর্থ অধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান

আলোচ্য অধ্যায়টিকে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ অবনীন্দ্রনাথের রচনায় বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতির উপাদান

লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথমতঃ বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতি, দ্বিতীয়তঃ ভাবধর্মী লোকসংস্কৃতি। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় ভাবধর্মী লোকসংস্কৃতির উপাদান কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা এই অধ্যায় এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোকপাত করব। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে তাঁর রচনায় বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতির উপাদানের ব্যবহার। এই উপাদানগুলি তাঁর রচনায় কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নে তা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হল।

লোকখাদ্য ও পানীয়

ক্ষীরের পুতুল ঃ

''... এই দেখ, তোমার জন্যে যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁই, মতিচুর মিঠাই এনেছি।''

(পৃষ্ঠা - ৪০)

''রাণী ক্ষীরের ছাঁই ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু, মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল।''

(পৃষ্ঠা - ৪০)

রাজকাহিনী / বাপ্পাদিত্য ঃ

''... আর সেই সাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মতো একটি শ্বেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা-আপনি ঝরে পড়ছে।''

(পৃষ্ঠা - ৭৩)

''মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন।''

(পৃষ্ঠা - ৭৪)

''হাতির পিঠে, উটের উপরে, গোলাগুলি চাল-ডাল, ... বড়ো-বড়ো জলায় খাবার জল রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৭৫)

চণ্ড ঃ

''... সেদিনের যা-কিছু চাল-ডাল সব তিনি অতিথিদের বিলিয়ে দিয়েছেন।''

(পৃষ্ঠা ১৪২)

''... যদিও সকালে এক-এক মুঠো ছোলা ছাড়া এ-পর্যন্ত কারো পেটে কিছু পড়েনি।''

(পৃষ্ঠা - ১৪৩)

''আগে যোধরাও আর তাঁর লোকজনদের মোটা আটার রুটি আর মুঁজলতার তরকারি খাইয়ে রাজর্ষি সব চেলাদের নিয়ে খেতে বসলেন ...।''

(পৃষ্ঠা -১৪৩)

রানা কুম্ভ ঃ

''দুধের পুরু সর, রাবড়ি, মালাই সেখানে তো পাওযাই যাবে না ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪৬)

''...কাপড়-চোপড় আটা-গম একটা খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে আবার পাহাড়ের উপর কেল্লায় উঠে যেতেন।''

(পৃষ্ঠা - ১৪৮)

''সে নানা কথা - আটাওয়ালা দুই বুড়োকে আটা বেচে টাকার বদলে মোহর পেয়েছে। ঘি দশ সের তার দাম কতই বা?''

(পৃষ্ঠা - ১৪৮)

ভূতপত্রীর দেশ ঃ

''মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৭৭)

''... আর তোমার পিসি সেই কলাইয়ের ডাল দিয়ে পান্তা ভাত দশ বছর অন্তর একদিন খান।''

(পৃষ্ঠা - ২১৫)

''... ডাঙার ওপর মাসির বাড়িতে খাও তোমরা শুকনো ভাত আর জলের নিচে পিসির বাড়িতে সবাই খায় ভিজে ভাত। তোমাদের কলাইয়ের ডাল পাতলা - যেন জল, আর এখানকার কলাইয়ের ডাল যেন মুক্তোর মতো ঝুরঝুরে।''

(পৃষ্ঠা - ২১৫)

''নিম লাগে মিষ্টি!

সন্দেশ লাগে তেতো!

মুড়কি বলে ঝাল!''

(পৃষ্ঠা - ২২৪)

''তালের বড়া কিম্বা তাল ফুলুরি, না হয় গাছপাকা তাল, এই তিনটের একটা যদি দিতে পার তো থাকি ...।''

(পৃষ্ঠা - ২২৪)

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

''বেড়ালটা গিয়ে অব্‌ধি রাত্তিরে দরজায় কে খুট-খুট করছে, ধামায় মুড়ি থকছে না ...।''

(পৃষ্ঠা - ৮৮)

''... আর অমনি উপর থেকে মেয়েরা খই বাতাসা ছড়াতে আরম্ভ করলে।''

(পৃষ্ঠা - ১২৪)

লোকসমাজে খাদ্য ও পানীয় হিসেবে ভাত, ডাল, মুড়ি, দুধ, ক্ষীর, মুরকি, ঘি, তালের বড়া, খেজুর রস ইত্যাদির প্রচলন দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্যেও এইসব উপাদানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

—০—

তথ্যসূত্র

ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৪০।

রাজকাহিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৭৩-৭৫, ১৪২-১৪৮।

ভূতপত্‌রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২২৪।

খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৮৮-১২৪।

—০—

লোক পোশাক-পরিচ্ছদ

শকুন্তলা ঃ

''... পরনে শাড়ি কোথায়?''

(পৃষ্ঠা - ১৮)

''... রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৯)

''তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৯)

ক্ষীরের পুতুল ঃ

''... পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন — ছেঁড়া কাঁথা।''

(পৃষ্ঠা - ২৭)

''... জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন।''

(পৃষ্ঠা - ৩০)

রাজকাহিনী / গোহ ঃ

''... তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটের শাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৬০)

''তাঁর যে বড়ো সাধ ছিল নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতো পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৬০)

''... তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেলল।''

(পৃষ্ঠা - ৬১)

''... এরি মধ্যে আবার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৬৫)

বাপ্পাদিত্য ঃ

''সকাল না হতে দলে দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৭২)

পদ্মনী ঃ

''পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে নিজের মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবরদেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন।''

(পৃষ্ঠা - ৯১)

হাম্বিরের রাজ্যলাভ ঃ

''গ্রামবাসী চাষা-চাষীর সাজে কমলকুমারী পথে দেখিয়ে যাচ্ছেন আর হাম্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে মস্ত পাগড়িতে মুখের আধখানা ঢেকে গুটি গুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেই দিকে।''

(পৃষ্ঠা - ১২৫)

''... গেরুয়া কাপড় রুদ্রাক্ষের মালা পরা পাঁচজন ভৈরবী আগুনের উপরে একখানা প্রকাণ্ড লোহার কড়া ঘিরে বসে রয়েছেন।''

(পৃষ্ঠা - ১২৬)

চণ্ড ঃ

''... পাকা চুলের উপরে ধবধবে পাগড়ি পরে লখারানা লক্কা পায়রাটি সেজে বসে আছেন।''

(পৃষ্ঠা - ১২৮)

রানা কুম্ভ ঃ

''... কাপড়-চোপড় আটা গম একটা খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে আবার পাহাড়ের উপর কেল্লায় উঠে যেতেন।''

(পৃষ্ঠা - ১৪৮)

''... তার দোকান থেকে দুটো বুড়ো কেন যে এত শাড়ি কেনে, সেটা প্রকাশ হয়েও হচ্ছে না ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪১)

সংগ্রামসিংহ ঃ

''... কিংখাবের লুঙ্গি কোমরে জড়িয়ে, জরির লপেটা ফেলে চম্পট দিলেন যেখানে থেকে এসেছিলেন সেই দিল্লীতে।''

(পৃষ্ঠা - ১৫৮)

নালক ঃ

''কেউ নূতন কাপড় দিলে তিনি তাই পারেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৫৩)

''তাদের পরনে রাঙা শাড়ি ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৫৫)

সমাজে বসবাসকারী মানুষজন নানা ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবাহর করে থাকে। পুরুষেরা ধুতি পাঞ্জাবী, চাদর, গামছা, লুঙ্গি, মহিলারা নানা ধরনের শাড়ি পরিধান করে। অবনীন্দ্রনাথের রচনাতেও এই নানা ধরণের পোশাকের ব্যবহার চোখে পড়ে।

—০—

তথ্যসূত্র

শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৮-১৯।

ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৭-৩০।

রাজকাহিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৬০-১৫৮।

নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৫৩-২৫৫।

—০—

লোক তৈজসপত্র

রাজকাহিনী / শিলাদিত্য ঃ

''... বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশসের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্য সূর্যদেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে ব্রাহ্মণ রাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘন্টা বাজাতেন।''

(পৃষ্ঠা - ৫০)

''... কেবল ননীর মতো কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পারলেন না বলে আরতির কাজটা বৃদ্ধকেই করতে হত।''

(পৃষ্ঠা - ৫১)

''... আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়েছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৫১)

''... ব্রাহ্মণ একটু হেসে বললেন - 'সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই।''

(পৃষ্ঠা - ৫১)

চণ্ড ঃ

''... ঘরে ঘরে আজ প্রজারা পিদিম জ্বালিয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় দোকানীরা ঝাড়লণ্ঠন ছবি আয়না দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে লোকের গায়ে কেবল গোলাপজলের পিচকিরি দিচ্ছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৯)

রানা কুম্ভ ঃ

''এদিকে পাহাড়ের উপরে ভাঙা কেল্লায় দুটি বুড়ো আর তাঁদের সেই কুড়োনো মেয়েটি একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত একখানা অন্ধকারের মধ্যে বসে গল্প করছেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৫১)

''ওদিকে সেই আঁধার ঘরের একটি পিদিম বাতাসে নিবু-নিবু করছে ...।

(পৃষ্ঠা - ১৫১)

''... জেগে রইল কেবল একটি পিদিমের আলো-অন্ধকারের মাঝে যেন কষ্ঠিপাথর - ঘষা একটুখানি সোনালী রঙ।''

(পৃষ্ঠা - ১৫৩)

''ঝড়ের বাতাস কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঘরের পিদিম নিবিয়ে দিলে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৫৩)

সংগ্রামসিংহ ঃ

''তারপর চারনীর সামনে একবার পিদিম নেড়ে ঘন্টা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চারপুত্রের মাথার পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বললেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৬০)

ভুতপত্রীর দেশ ঃ

''... ফড়িংগুলো যেমন লণ্ঠনের চারিদিকে মাথা ঠুকে মরে, ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৮৮)

''... একটি পিদিম আর এক ঘড়া জল দিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২০২)

''চেয়ে দেখি চারদিকে কেবল গামলা আর জালা ...।''

(পৃষ্ঠা - ২১২)

''ও কিচ্‌কিন্দে, এ ভাঁড়টার মুখ কোনদিকে? ...।''

(পৃষ্ঠা - ২১২)

''কিচ্‌কিন্দে তাড়াতাড়ি এক ঘটি বালি এনে দিল ...।''

(পৃষ্ঠা - ২১৭)

''পিসির হাতের কলাইয়ের ডাল আর কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে একপেট ভাত খেয়ে জলের ঘটিতে চুমুক দিয়ে দেখি এক ঘটি বালি - বেশ পরিষ্কার ...।''

(পৃষ্ঠা - ২১৮)

নালক ঃ

''... রাণীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৩৫)

''... পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল-সিঁদুর পুজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৫৪)

''সুজাতা তখন গরু-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে সকালের জন্যে পুজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন।''

(পৃষ্ঠা - ২৫৫)

''... পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপরে চাপিয়ে দিলে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৫৬)

আলোর ফুলকি ঃ

''কুঁকড়ো অমনি একখানি ডানা বাজিয়ে সোনালিয়াকে তুলে ধরে আর এক ডানার ঝাপটা দিয়ে গামলা থেকে জলের ছিটে আর বাতাস দিতে থাকলেন খুব আস্তে আস্তে।''

(পৃষ্ঠা - ১৭)

''জিম্মা বলেন, 'আমার ওই বাক্সটার মধ্যে লুকোতে পারা যেতে পারে, ইনি যদি রাজি হন।' ''

(পৃষ্ঠা - ১৮)

''প্রথমেই, যেটা থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সোনালিয়ার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে কুঁকড়ো তাকে বাঁচিয়েছিলেন সেই টিনের গামলাটা ...।''

(পৃষ্ঠা - ২০)

''... আর এই যে পুরোনো লাল মাটির গামলা ...।''

(পৃষ্ঠা - ২০)

''মোচলমানের সঙ্গে এক ঘটিতে জল খেতে আমি ওকে স্বচক্ষে দেখেছি।''

(পৃষ্ঠা - ২৬)

''... 'তারপর যদি বলি ওই মাটির টবটা দিব্যি শুনতে পায় তবে কি তুমি অবাক হবে নাকি।' ''

(পৃষ্ঠা - ৪৩)

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

''দুজন জোনাক পোকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ভোর রাত্তিরে ঘরে ফিরছিল ...।''

(পৃষ্ঠা - ১০২)

''... ওখানে কেউ পিদিম নিভিয়ে অন্ধকারে লুকোয় ...।''

(পৃষ্ঠা - ১০৩)

''... আর এক হাতে জলের ঘটি নিয়ে এসে বললেন, 'ডাকলে কেন?' ''

(পৃষ্ঠা - ১১৭)

''আমার লণ্ঠন বইবে কে?''

(পৃষ্ঠা - ১১৮)

''যেমন খাব না বলা, আমনি খাতাঞ্চি তাকের উপর থেকে ভাঁড় নিয়ে সোনাকে বললেন, 'দে খাইয়ে।' ''

(পৃষ্ঠা - ১১৯)

''... আমি তোকে বাটি থেকে দুধ দেব।''

(পৃষ্ঠা - ১২০)

''পাঙুটি দেখে, মস্ত পেট নিয়ে মোটা কলসীটা আর লম্বা গলা নিয়ে জলের কুঁজোটা জলচৌকির দুপাশে বসে সিঁদুরের কৌটো, চুমকি ঘটি, ছোটো শিশি, মলমের বাটি ...।''

(পৃষ্ঠা - ২১২)

''... এক-এক ডালে একটি সাদ আর একটি লাল লণ্ঠন ফানুশের তারার মতো ঝোলানো ...।''

(পৃষ্ঠা - ১২৫)

''... ছিল সেখানে কর্তার দুধের বাটি, গেলাস, থালা, ঝনঝন করে উল্টে পড়ল।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৩)

বুড়ো আংলা ঃ

''... কাঁসার বাসন বার করে, ঝেড়ে পুছে যেখানকার যা গুছিয়ে রাখতেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৮)

''... সিঁদুরের টিপ দিয়ে বলির পাঁঠা যেমন করে সাজায়, তেমনি করে সেই অন্ধকার পাতালপুরীতে এক থালা খাবার, এক ভাঁড় জল দিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪২)

বাদশাহী গল্প ঃ

''... সে লণ্ঠন হাতে লাঠি ঠক্‌ঠকাতে এদিক ওদিক ঘুরে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৯৭)

''রোজ ফুটো হাঁড়ির জরি মানা দিতে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৯৮)

''তার পরেই থালা, ঘটি, বাটি বেচে হরিচরণ কর্মকার।''

(পৃষ্ঠা - ৩০০)

পথে বিপথে ঃ

''... লক্ষ্মীর ঘটটা উল্টে তিনি সরস্বতীর বীণার তুম্বি বানিয়ে নিয়েছেন।''

(পৃষ্ঠা - ২৮)

''... তিনি বলতেন লণ্ঠনের উপর গোলাপ ঢাকা দিলেও যা, মানুষের মাথায় টুপি চাপালেও তা — আলো পাওয়া শক্ত হয়।''

(পৃষ্ঠা - ৩৬)

''... ঝক্‌ঝকে কতকগুলো তামার ডেকচির কাছে বসে নীল-পাজামা পরা একটা ছোকরা খালাসি রঙ করা একটা পাখির খাঁচা বেশ করে জল দিয়ে ধুচ্ছে।''

(পৃষ্ঠা - ৪৭)

''বলেই অবিন খপ্ করে মীর সাহেবের বিনা অনুমতিতে ডাবা থেকে এক-থাবা পান তুলে নিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৮)

''... এবং খালি জল চাইতে যেমন জলখাবারের থালা, ...।''

(পৃষ্ঠা - ৫৮)

মাসি ঃ

''... সর-সুদ্ধ খালি বাটি আমায় ধরে দিতে - চুমুক দিয়ে যদি বলতেম, 'দুধ কেথা গেল?' ''

(পৃষ্ঠা - ১১৫)

'... তার একদিকে গলাভাঙা একটা কুঁজো, আর একদিকে কানাভাঙা কলসি একটা।''

(পৃষ্ঠা - ১১৮)

''... ঝগড়া লাগত কাঁসাতে-পিতলে, লোহার কড়াতে হাতাতে বেড়িতে খুন্তিতে ...।

(পৃষ্ঠা - ১১৮)

''... পুরোনো লণ্ঠনটিই বা কী হল তা তুমিই জান।''

(পৃষ্ঠা - ১২৫)

''হাত ভেঙে গেছে হাঁড়ি ঠেলা অসম্ভব।''

(পৃষ্ঠা - ১২৫)

'চাংড়াদিদি দেখিয়েছে ঠাকুর ঘরে কুলুঙ্গিতে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে তোলা ছিল লাল সুতোয় বাঁধা সোনার তাবিচ ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪৬)

মারুতির পুঁথি ঃ

''এখন, ভাতের বাটিতে ধরে টান না-দিয়ে ব্রহ্মকটাই ভেদ করলেই গেছি ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩)

''ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে ঠাণ্ডা জল যেন ঢেলে দিলে ...।''

(পৃষ্ঠা -১৪)

''রাজবাড়ি তো নয়, যেন ইঁটের পাঁজার উপরে ছোটো-বড়ো মেটে গামলা, ঢাকাই জালা উল্টোনো দেখা যায়।''

(পৃষ্ঠা - ৪৪)

চাঁই বুড়োর পুঁথি ঃ

''দে মা কিছু এক বাটি কোপ্তা কি গোপ্তা।''

(পৃষ্ঠা - ১১৬)

''রন্ধনশালায় চড়েনি হাঁড়ি ...।''

পৃষ্ঠা - ১২২)

''কেউ ধোবে ডাবর ...।''

(পৃষ্ঠা - ১২৫)

''... কেউ আনে জালা, কেউ আনে কলসী ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৬)

''সিঁদ চলে, চলে খুন্তি ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৬৮)

মহাবীরের পুঁথি ঃ

''হাঁড়ি মাথা রাবণ রাজা পুকুরে দেয় ডুব ...।''

(পৃষ্ঠা - ২০৩)

''লণ্ঠন জ্বেলেছে যেন পথের পাহারা।''

(পৃষ্ঠা - ২৩৩)

''এই বলে চাঁই-বুড়ো কামারটুলিতে খুরি-গেলাস কিনতে গেলেন।''

(পৃষ্ঠা - ২৪২)

''... ইহলোকেই খাই দাই আর বাজাই কাঁসি।''

(পৃষ্ঠা - ২৫৭)

উড়নচণ্ডীর পালা ঃ

''তেল দেব আর জ্বালাতে তোমার লণ্ঠনটায় পায় পায় কাদায় পা পিছলায় পাঁকে পড়ি বারে বারে হে।''

(পৃষ্ঠা - ১৬)

অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা জুড়ে লোকতৈজসপত্রের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তৈজসপত্র হিসেবে প্রদীপ, হাঁড়ি, কড়া, খুন্তি, গামলা, হাতা, বাক্স, গেলাস ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবহার লোকসামাজে চোখে পড়ে। লেখকও নিপুণভাবে তাঁর রচনায় এগুলির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

—০—

তথ্যসূত্র

রাজকাহিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৫০-১৬০।

ভূতপত্‌রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৮৮-২১৮।

নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৩৫-২৫৬।

আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৭-৪৩।

খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১০২-১৩৩।

বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৩৮-১৪২।

বাদশাহী গল্প, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২৯৭-৩০০।

পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ২৮-৫৮।

মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১১৫-১৪৬।

মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১৩-৪৪।

চাঁইবুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১১৬-১৫৮।

মহাবীরের পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২০৩-২৫৭।

উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৬।

—০—

লোক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র

আপন কথা ঃ

''... হাতে একটা পেনসিল-কাটা ছুরি, কর্তাকে সহজে দেখার উপায় নেই।''

(পৃষ্ঠা - ৪০)

'' ... পাছে ধরা পড়ি সেই ভয়ে হাতুড়ি তোলার অবসর হত না ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪০)

''... ঘড়িতে হাতুড়ি পিটিয়ে চললেও দারোয়ান কিছু বলবে না।''

(পৃষ্ঠা - ৪২)

''... রোজই দেখি, আর মিস্ত্রির মতো হাতুড়ি পেরেক অস্ত্রশস্ত্র চালাবার জন্য হাত নিসপিস করে।''

(পৃষ্ঠা - ৪৬)

''... সেই ফাঁকে একটা বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে মেরেছি দু-তিন কোপ ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৬)

ঘরোয়া ঃ

''সিন উঠল, ভামশা মন্ত্রী ইয়া লম্বা দাড়ি, রাজপুত্তর, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, তলোয়ারের ঝম্‌কানি, হাসিকান্না — ডুবে গেছি তাতে।''

(পৃষ্ঠা - ১১৮)

''... আর ভীলদের মতো সেজে, মাথায় পালক গুঁজে তীর-ধনুক নিয়ে সে যা নাচলেন, আর গাইলেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ১১৮)

''আর ভৈরবী যখন দু-হাত তুলে খাঁড়া হাতে ম্যায় ভুঁখাহুঁ, বলে বের হত তখন আমাদের বুকের ভিতর গুরংগুং করে উঠত।''

(পৃষ্ঠা - ১২০)

''... এই তখন সেই খোলা তলোয়ার ছোরা ঘুরিয়ে কাবুলীদের নাচ নেচে দিলুম আমরা ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৮)

''... ধনুকে তীর লাগিয়ে টানাটানি করতে করতে যেই বলা ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৯)

জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ

''আঃ হাঃ, আবার আমার পুতুল গড়বার হাতুড়ি বাটালি নিয়ে টানাটানি কর কেন? স্থির হও, শোনো আর একটা মজার কথা ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৭৫)

''... কোমরে গোঁজা বাঁকা ভোজালি, সে ছিল দেউড়ির শোভা।''

(পৃষ্ঠা - ১৮৬)

''... সেই সোনার মেডেল আর একটি গাছকাটা কাঁচি ভাগবতকে তিনি বকশিস দিলেন।''

(পৃষ্ঠা - ১৯৪)

''... চাকর বেশ শানানো ছুরি এনে হাজির করলে বলতেন, 'ওটা কেনে? আমার সেই আম কাটা ভোঁতা ছুরি নিয়ে এসো।' ''

(পৃষ্ঠা - ২১৫)

শকুন্তলা ঃ

''... কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্ষা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩)

''... তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪)

''... হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৫)

রাজকাহিনী / গোহ ঃ

''... বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল — শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন।''

(পৃষ্ঠা - ৫৯)

''... পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি ...।''

(পৃষ্ঠা - ৬৬)

চণ্ড ঃ

"... সেদিন চণ্ড সব দুঃখ সব অপমান ভুলে অনেক দিনের কোণে রাখা তলোয়ার আর একবার কোমরে বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন।"

(পৃষ্ঠা - ১৩৮)

"... চণ্ড যখন চিতোর ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনশো ভীল তাঁর সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ...।"

(পৃষ্ঠা - ১৩৮)

"... লোকে সব গ্রামে-গ্রামে মাঠে-ঘাটে এইসব গুজব শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠে লাঠি-তলোয়ার তীর-ধনুক নিয়ে চিতোরের দিকে দল বেঁধে চলেছে ...।"

(পৃষ্ঠা - ১৩৮)

"... সকালে উঠে সে একখানা কুড়ুল নিয়ে রান্নার কাঠ কাটতে চলেছে এমন সময় একজন বুড়ো মাড়োয়ারী সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা ...।"

(পৃষ্ঠা - ১৪৩)

রানা কুম্ভ ঃ

"... বুকের দুই দিকে দুটো বল্লমের চোট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।"

(পৃষ্ঠা - ১৪৭)

"... রানার হাতের ছুরি সাঁ করে গিয়ে বিঁধল হিঙ্গুলিয়ার বিশ্বাসী প্রাণটি ধুক-ধুক করছে ঠিক যেখানে ...।"

(পৃষ্ঠা - ১৫১)

"... তিনজনকেই চমকে উঠে দেখলেন বিনখানা খোলা তলোয়ার মাথার উপরে ঝকঝক করছে ...।"

(পৃষ্ঠা - ১৫৩)

"... একটি ছুরির ঘায়ে; তার সব অস্পর্ধা শেষ করে দিলেন।"

(পৃষ্ঠা - ১৬৫)

আলোর ফুলকি ঃ

"... আর কখনো বা ওই লাঙলটাকে নয়তো কোদালটাকে এই ঢেঁকি ওইখানে ওই কুড়ুল এই কাস্তেকে বলি, ভয় নেই আলোকে জাগিয়ে দিতে ভু-ল-ব-না ভু-ল-ব-না।"

(পৃষ্ঠা - ৩৭)

''কুঁকড়ো বললেন, 'কামারের হাতুড়ি পড়ছে।' ''

(পৃষ্ঠা - ৪১)

''... দর্জির হাতে সেলাই করা, কলে কাটা, কাঁচি দিয়ে ছাঁটা নকল ছাড়া এরা কিছুই নয়।''

(পৃষ্ঠা - ৫৩)

''জিম্মা দেখছে হায়দারিটা ছোরা না চালায় ...।''

(পৃষ্ঠা - ৫৯)

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

''সোনা একজন পাকা গিন্নী হবে, বিধাতা তার কপালে হেঁসেল, হাতা, বেড়ি, বঁটি, ঢেঁকি; এককড়া দুধ আর বাজার খরচের ধারাপাত লিখেছিলেন ...।''

(পৃষ্ঠা -১২৩)

''পুতু গম্ভীর হয়ে টেঁক থেকে ছুঁচ বার করে বললেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ১২৬)

''... রিদয়ের ট্যাঁকে এটা ওটা কাটতে একটা ছুরি থাকত ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৬১)

হানাবাড়ির কারখানা ঃ

''হয়ে ত্রস্ত রাজারে খবর দিল নফর - অন্দরের দোরে কড়া নাড়ছেন এক কাপালিক — হাতে একখানা কাস্তে মস্ত।''

(পৃষ্ঠা - ২৬৯)

''কলের মন্তরে খাজনা ঘরে দোর পড়ে গেল — উলটা-পালটা মন্তরে হাতুড়ি শাবলে কল-ঘরের কল-কবজা পথ দিলে না চোর পালাতো আজ।''

(পৃষ্ঠা - ২৭৩)

বাদশাহী গল্প ঃ

''প্রতিঙ্গে কার? হাতে যাহ জাঁতি যন্তর।''

(পৃষ্ঠা - ২৯৯)

দেবীর বাহন ঃ

''... বাজে বকিসনে, চট করে হাতুড়ি আর বাটালি আর ছেনি আর খন্ত নিয়ে আয় ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩৫২)

উজোর ঘরের কান্না ঃ

''কাটারি দিয়া কাট্‌ল না। ছুরির ঘায়ে কাট্‌ল।''

(পৃষ্ঠা - ৩৫৪)

'' ... যেন এক বাণ্ডিল হলো-গ্রাউণ্ড ক্ষুরকে সাজিয়ে রেখেছে পাশাপাশি খাড়া করে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩৬৪)

পথে বিপথে ঃ

''শাণিত ছোরার উপরে আলো পড়লে যেমন হয় ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩২)

''... সন্ধ্যাবেলা ছুরি হাত তারা ঘুরে বেড়াত ...।''

(পৃষ্ঠা - ৭৯)

মাসি ঃ

''... পুরুষ-মানুষটি নিয়েছে শাবল-কোদাল ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩২)

মারুতির পুঁথি ঃ

''জাঁতিতে সুপারি কাটে দর্পণে দেখে মুখ।''

(পৃষ্ঠা - ৩৩)

''প্রত্যুষে পুঁথি - ঠাকুরের পেঁপে পাড়তে গিয়ে দেখি জোড়া পেঁপের একটির গোড়ায় কাটারির কোপ ...।''

(পৃষ্ঠা - ৮২)

''রোস্ আগে ছুরি শানাই।''

(পৃষ্ঠা - ৮৬)

চাঁইবুড়োর পুঁথি ঃ

''... একটা শাবল, একটা হাতুড়ি, একটা সিঁদকাঠি, একটা কোদাল, একটা কুড়ুল ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৬৩)

''রাবণ বললেন — 'মামা, শুধু বাড়লেই হল না - শাবলখানি ধরো ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৬৫)

''হাতুড়ি ওঠে না হাতে এত হয়েছি দুর্বল।''

(পৃষ্ঠা - ১৬৮)

শিব-সদাগর ঃ

''ভোঁতা পাখি ধরা ফাঁদ, গাছকাটা কুড়ুল নিয়ে রাজার লোক বসে নেই ভাবছিস?''

(পৃষ্ঠা - ২৯২)

যাত্রাগাণে রামায়ণ ঃ

''... কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।''

(পৃষ্ঠা - ২)

''... আরে বীরের ছেলে তীর মারে শিব মারে জঙ্গী।''

(পৃষ্ঠা - ৫)

''জাগা ঘরে যায় না চুরি; বাসায় না চোর গলায় ছুরি ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৯)

''খণ্ডো খরশান টাঙি অতি ভয়ঙ্কর ...।''

(পৃষ্ঠা - ২২)

''... লাঙলের ফালে আসি উঠিলেন ধন্যা ...।''

(পৃষ্ঠা - ৭৮)

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ঃ

''... ছোটোবেলা থেকে ছেলেগুলো সেখানে দেখছি কেউ পাথর কেউ রং-তুলি কেউ বাটালি কেউ হাতুড়ি এমনি সব জিনিস নিয়ে কেমন নিজেদের অজ্ঞাতসারে খেলতে খেলতে আর্টিস্ট ...।''

(পৃষ্ঠা - ১২)

''...এইটেই তারা হরিণের শিং মাছের কাঁটার বাটালি একটুখানি পাথরের ছুরি একটুকরো গেরি মাটি ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪)

''... তারা সংযত হয়ে তুলি বাটালি, সুঁচ, হাতুড়ি, এমনি নানা জিনিসকে চালাতে শিখে নিলে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩৯)

''... কিন্তু রচনা প্রকাশ হবার আগেই এমন একটি জায়গার সৃষ্টি হয়ে বসে যে যেখানে কোদাল কুড়ুল শূল শাল কিছু চলে না ...।''

(পৃষ্ঠা - ৭৯)

''... হাতের ছুঁচ চালানোর যতন আর আনন্দ ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৩২)

সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে লোক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। যে মানুষ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রথম দিকে গাছের ডাল, এবড়ো খেবড়ো পাথর ব্যবহার করত, পরবর্তী ক্ষেত্রে এসবের পরিবর্তে মানুষজন হাতে তুলে নিয়েছে তীর, ধনুক, বল্লম, ছুরি, কাঁচি, কাস্তে, কাটারি ইত্যাদি। আর কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে লাঙল, কোদাল, শাবল ইত্যাদি যন্ত্র। এছাড়াও করাত, বাটালি, হাতুড়ি, ছেনি ইত্যাদির ব্যবহারও মানুষ তার প্রয়োজনে করেছে। অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাতেও এই লোকযন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়।

—০—

তথ্যসূত্র

আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৪০-৪৬।

ঘরোয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১১৮-১৩৯।

জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৭৫-২১৫।

শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৩-১৫।

রাজকাহিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৫৯-১৬৫।

আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২০-৫৯।

খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১২৩-১৬১।

হানাবাড়ির কারখানা, তদেব, পৃঃ ২৬৯-২৭৩।

বাদশাহী গল্প, তদেব, পৃঃ ২৯৯।

দেবীর বাহন, তদেব, পৃঃ ৩৫২।

উজোর ঘরের যাত্রা, তদেব, পৃঃ ৩৫৪-৩৬৪।

পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৩২-৭৯।

মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৩২।

মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩৩-৮৬।

চাঁই বুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১৬৩-১৬৮।

শিব-সদাগর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২৯২।

যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ২-৭৮।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ১২-১৩২।

—০—

লোক অলংকার

আপন কথা ঃ

''কড়ে আঙুল বলে খাব; আংটির আঙুল বলে কোথায় পাব ...।''

''... সোনালি পুঁতির উপরে ফিরোজার ফুল বসানো ছোট্ট বালা দুগাছি, সোনার বালার চেয়েও ঢের সুন্দর দেখতে।''

(পৃষ্ঠা - ৪৭)

জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ

''... বললুম, 'এটি দিয়ে আমার জন্য একটি আংটি করিয়ে দিয়ো।''

(পৃষ্ঠা - ২৩১)

শকুন্তলা ঃ

''... হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৮)

''আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৯)

ক্ষীরের পুতুল ঃ

''রাণী রাঙা পা নাচিয়ে নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে বললেন ...।''

রাজকাহিনী / বাপ্পাদিত্য ঃ

''রাজকুমারীর সখী সেই বালা-হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৭৩)

পদ্মিনী ঃ

''তারপর মহারানা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নূপুরের ঝিন-ঝিন শব্দ পেলেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৯৯)

বুড়ো আংলা ঃ

''... নূপুরের শব্দ শুনলে গাই-গরু সব চারদিক থেকে হামা দিয়ে ছুটে আসত গা ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৫৫)

পথে বিপথে ঃ

''... কোন্ সূত্রে কোনখান থেকে আংটিটা তাঁর আঙুলের গাঁটে এসে যে আটকে রইল ...।''

(পৃষ্ঠা - ৭৮)

মাসি ঃ

''আমার বউকে রূপোর বালা গড়িয়ে দেবেন মাসি?''

(পৃষ্ঠা - ১২৭)

মউর ছালের পালা ঃ

''নূপুর ঘুঙুর কেমন বাজে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৪)

এস্‌পার ওস্‌পার ঃ

''আত্মা, এ যে একটা কিসের আংটি।''

(পৃষ্ঠা -২২৬)

অলঙ্কার দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। আর মানুষ এই অলঙ্কারের মধ্য দিয়েই নিজেকে আরো সুন্দর ভাবে মেলে ধরেছে। লৌকিক সমাজেও নানা অলঙ্কার এর প্রচলন ছিল। যার মধ্যে আংটি, বালা, নূপুর, ঘুঙুর, কানের দুল, পাশা প্রভৃতির ব্যবহার চোখে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথের রচনাতেও এইসব অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

—০—

তথ্যসূত্র

আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৫-৪৭।

জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্ররচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৩১।

শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৮-১৯।

ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৭।

রাজকাহিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৭৩-৯৯।

বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২৫৫।

পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৭৮।

মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১২৭।

মউর ছালের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৪৪।

—০—

লোক প্রসাধন

শকুন্তলা ঃ

''... কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আলতা দিলে? ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৮)

ক্ষীরের পুতুল ঃ

''... সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা, পরায়, চুল বাঁধে।''

(পৃষ্ঠা - ২৭)

''... কাজল-লতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩১)

নালক ঃ

''... পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল-সিঁদুর পুজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৫২)

কোণের ঘর ঃ

''... এক মস্ত দাড়িওয়ালা মহারাজা সে, আর পাকা চুলে সিঁদুর পরা মহারাণী তিনি।

''... তোমার চোখ দুটো ছিল ঠিক ওই আমার পোষা হারিণটার চোখের মতো একেবারে কাজল মাখা ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩৩৬)

আলোর ফুলকি ঃ

''... এই যেটা বুড়ো বয়সে ঠোঁটে আলতা দিয়ে বেড়ায় সেইটে নাকি।''

(পৃষ্ঠা - ১৬)

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

''একমাস পরে ষষ্ঠী পুজো, ঘটে একটু সিঁদুর ডাব আর আম পাতা দিয়ে খাতাঞ্চিমশায় সেরে দিলেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৮৩)

''... রায়গিন্নীদের আলতা পরবার পা ঘষবার জন্য ...।''

(পৃষ্ঠা - ৯৯)

বুড়ো আংলা ঃ

''... সিঁদুরের টিপ দিয়ে বলির পাঁঠা যেমন করে সাজায় তেমনি করে সেই অন্ধকার পাতাল পুরিতে এক থালা খাবার ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪২)

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় লোকপ্রসাধনের ব্যবহার তেমন ভাবে চোখে পড়ে না। তবে সিঁদুর, আলতা, কাজল প্রভৃতি প্রসাধনের ব্যবহার তিনি তাঁর রচনায় করেছেন।

—০—

তথ্যসূত্র

শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৮।

ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৭-৩১।

নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৫৬।

কোণের ঘর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬।

আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৬।

খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৮৩।

বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৪২।

—০—

লোক বাদ্যযন্ত্র

আপন কথা ঃ

''... ঠিক এই সময় শুনি ঠাকুর ঘরে ভোগের ঘন্টা শাঁক বেজে ওঠে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৫৫)

''... কুলুঙ্গিতে বসে আমি শুনতে থাকলেম কাঁসর বাজছে — তারপর ... তারপর ... তারপর ...।''

(পৃষ্ঠা - ৫৫)

ঘরোয়া ঃ

''... দেখো বাবা, দশ মিনিটের কথা, দশ মিনিট গেছে কিনা — আমি পাঙচুয়ালি ঘন্টা দিয়েছি।''

(পৃষ্ঠা - ১১৫)

জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ

''... ঢোল বাজছে গামুর গুমুর, হোলি হ্যায় হোলি হ্যায়, আর আবির উড়ছে।''

(পৃষ্ঠা - ১৮৭)

''... তার পূর্ব পুরুষ ভালো মৃদঙ্গ বাজিয়ে, নিজেও বাজায় ভালো।''

(পৃষ্ঠা - ২২১)

''... এক পাশে একটি মাদল বাজছে, একটি মশাল জ্বলছে, একটি দেবদাসী নাচছে।''

(পৃষ্ঠা - ২৮৭)

''মানুষ জাগল। রিকশা চলল ঘন্টা বাজিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৮৮)

''... নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম। বেশ দিন যায়।''

(পৃষ্ঠা - ২৯২)

স্মৃতির পরশ ঃ

''... শহর ছাড়া গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথে বাঁশি বাজছে কোনখানে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩২৮)

শকুন্তলা ঃ

''... বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বট পাতার ভেলা ছিল ...।''

(পৃষ্ঠা - ১১)

ক্ষীরের পুতুল ঃ

''... ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে লাগল।''

(পৃষ্ঠা - ৪২)

''এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাসর, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাক-ঢোল নিয়ে ঢাকী-ঢুলী, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রী — সারা রাত বাঁশি বাজিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৩)

''... দাস-দাসী শাঁক বাজালে, হুলু দিলে — বর-কনের বিয়ে হল।''

রাজকাহিনী / শিলাদিত্য ঃ

''... প্রতিদিন সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষস রাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘন্টা বাজাতেন।''

(পৃষ্ঠা - ৫০)

হাম্বির ঃ

''... দূর থেকে মাদল আর ঝাঁঝরের হুম হুম ঝুমঝুম আওয়াজ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১১৬)

''হাম্বির ভারে-ভারে মহুয়ার কলসী দলে-দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ১১৮)

রানা কুম্ভ ঃ

''... ভিখারিনীর মতো একতারা বাজিয়ে পথে বার হলেন। আর রানা বার হলেন নতুন রাণীর খোঁজে।''

(পৃষ্ঠা - ১৫৫)

ভূতপতরীর দেশ ঃ

''শাঁখচুর্ণিরা সব শাঁখ বাজিয়ে কলাই খেত থেকে পাখি তাড়াচ্ছে বাবু ...।''

(পৃষ্ঠা - ২১৫)

নালক ঃ

''... ভিখারী যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৪৪)

''সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যায় শাঁখ-ঘন্টা বাজছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৬০)

কারিগর ও বাজিকর ঃ

''কারিগর একটু হেসে বাঁশিতে ফুঁ দিতেই একধার থেকে একটা লোহার পাখি সভার মধ্যিখানে কারিগরের চেলারা এনে হাজির করলে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩২৯)

আলোর ফুলকি ঃ

''... কাজ আরম্ভ হবার আগে এসো ভাই সব এককাট্টা হয়ে এক সুরে নিজের নিজের ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দিই ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৭)

''সোনালিয়া বলে চলল, আকাশের গায়ে কে যেন কাঁসর পিটছে।''

(পৃষ্ঠা - ৪১)

''... তুড়ি রাগিনীতে খোল বাজিয়ে সূর্যের রূপবর্ণনা।''

(পৃষ্ঠা - ৪৮)

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

''... তার মাঝে ছোট্ট একটি রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৯০)

''... আর হলদেগুড়ির মাঠে গামুর গুমুর ঢোল বাজছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৯০)

''তখন রাত হচ্ছে। ওপারে জগন্নাথঘাঠে কাঁসর ঘন্টা বাজছে ...।

(পৃষ্ঠা - ১০২)

বুড়ো আংলা ঃ

''... গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্ট ঢোলকটি ঝুলছে।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৯)

ইচ্ছাময়ী বটিকা ঃ

''ঢাকের কাটিতে তাড়া করছে যেন ঢাকি।''

(পৃষ্ঠা - ৩৭৬)

রতনমালার বিয়ে ঃ

'মুখুটির সন্ধান করে করে গুরুমশাই হয়রান। ওদিকে বেজে উঠেছে ঢাক-ঢোল — রতনমালার

বিয়ে।''

(পৃষ্ঠা - ৪৩৬)

পথে বিপথে ঃ

''... তারই তলায় গাছের আড়ালে একটি মন্দিরের ঘাটে বাঁশিতে সাহানার সুর বাজছে।''

(পৃষ্ঠা - ৩৮)

''এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্বর নাই। পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্ত্রস্বনে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৮৯)

মাসি ঃ

''... ঢাকে ঢোলে কাঠি পড়ে আর কি ...।''

(পৃষ্ঠা - ১১৭)

''... একজন বাঁশি বাজাচ্ছে আর একজন চেয়ে দেখছে তার দিকে।''

(পৃষ্ঠা - ১৪৬)

মারুতির পুঁথি ঃ

''... নাচতে পারে ডুগডুকি খঞ্জরি বাজিয়ে এমন যে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২০)

চাঁইবুড়োর পুঁথি ঃ

''ইহলোকেই খাই দাই ভুঁড়ি বাজাই — বাজাই কাঁশি।''

(পৃষ্ঠা - ১০১)

''তো কী কাঁদব, না নাচব, না উলু দেব, না শাঁখ বাজাব, না।''

(পৃষ্ঠা - ১৪৪)

মহাবীরের পুঁথি ঃ

''... তখন মহোদর যুক্তি দিলেন — ঢাক, ঢোল, ঝাঁজ, শাঁখ যা কিছু আছে বাজা ঘুলঘুলির কাছে।''

(পৃষ্ঠা - ২২৮)

লম্বকর্ণ পালা ঃ

''কর্নেট ও কর্তাল, ঢোল, খোল, নবীন, ললিত, ললিন, অধীন।''

(পৃষ্ঠা - ১২৬)

হংসনামা ঃ

''... একবার শাঁখ বাজছে। একবার ঘন্টা ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৯২)

সমাজে লোক বাদ্যযন্ত্রের নানান উপলক্ষ্যে ব্যবহার দেখা যায়। পূজার্চনাতে ঢাক, ঢোল, ঘন্টা, কাঁসর, ঝাঁঝর, সামাজিক উৎসব ও অমোদে-প্রমোদে মাদল, শাঁখ, একতারা, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। অবনীন্দ্রনাথের রচনাতেও এই সকল বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে।

—০—

তথ্যসূত্র

আপনকথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৫৫।

ঘরোয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১১৫।

জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৮৭, ২২১, ২৮৭-২৯২।

স্মৃতির পরশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৩২৮।

শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১১।

ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৪২-৪৭।

রাজকাহিনী / শিলাদিত্য, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৫০।

রাজকাহিনী / হাম্বির, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবক ১৯৭৪, পৃঃ ১১৬ - ১১৮।

রাজকাহিনী / রাণা কুম্ভ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৫৫।

ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২১৫।

নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৪৪-২৬০।

কারিগর ও বাজিকর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩২৯।

আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২৭, ৪১, ৪৮।

খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৯০, ১০২।

বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৩৯।

ইচ্ছাময়ী বটিকা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩০৬।

রতনমালার বিয়ে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৩৬।

পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৩৮, ৮৯।

মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১১৭, ১৪৬।

মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২০।

চাঁইবুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১০১, ১৪৪।

মহাবীরের পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২২৮।

লম্বকর্ণ পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১২৫।

হংসনামা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৯২।

—০—

লোক যানবাহন

আপন কথা ঃ

''একটার পর একটা ইস্কুল গাড়ি পাল্‌কি এসে দলে দলে সোয়ারি নামিয়ে চলে।''

(পৃষ্ঠা - ২৫)

''... নৌকার ছই-বাঁধা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে পাকা করে তুলতে থাকল আমাকে রামলাল।''

(পৃষ্ঠা - ৩৭)

জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ

''... পাল্‌কির ভিতরে বসে আচ্ছা করে দরজা বন্ধ করে অতি ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরি শেষে।''

(পৃষ্ঠা - ১৬৪)

''... দলের পর দল নৌকো বজরা, তাতে কত লোক গান গাইতে গাইতে, হল্লা করতে চলেছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৮০)

শকুন্তলা ঃ

''... পাল্‌কি ছাড়া যে এক পা চলে না ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪)

ক্ষীরের পুতুল ঃ

''... খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, পাল্‌কির ভিতর ক্ষীরের পুতুল ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৩)

নালক ঃ

''নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৬২)

আলোর ফুলকি ঃ

''... সোনালিয়া বলে উঠল, নৌকোর মতো ভেসে বেড়াতে তো তোমায় কোনোদিন দেখি নি, মাটি আঁচড়াতে প্রায়ই দেখি বটে।''

(পৃষ্ঠা - ৩৫)

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

''... বেড়াল কোমার বেঁধে পাল্‌কির সঙ্গে চলেছে ...।'

(পৃষ্ঠা - ৯১)

''... নৌকো নয় তো আর কিছু বানিয়ে, খেলা করে নষ্ট করেছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৯৬)

বুড়ো আংলা ঃ

''... আয় আমার এই পাল্‌কিতে।''

(পৃষ্ঠা - ১৯৮)

''... নদীতে একখানি নৌকো নেই ...।''

(পৃষ্ঠা - ২১৫)

বাদশাহী গল্প ঃ

''কিসে গেল? পাল্‌কিতে?''

(পৃষ্ঠা - ২৯১)

সিকস্তি পয়স্তি কথা ঃ

''... কালাজ্বরে অঘোর খাতাঞ্চিমশয়াকে নিয়ে দুপুলিয়ার কাছারিবাড়ির ঘাটে নৌকো লাগল।''

(পৃষ্ঠা - ৪০০)

পথে বিপথে ঃ

''... আমাদের জাহাজ থেকে একটা ঢেউ গড়িয়ে গিয়ে ডিঙা দুখানকে খুব একটা দোলা দিয়ে চলে গেল।''

(পৃষ্ঠা - ১৪)

''... গঙ্গার উপরে কতকগুলো কালো কালো ডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তীরের উপরে বসে 'মা', 'মা' বলে চিৎকার করে কাঁদছি ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৯)

''... বালির চড়ার উপরে গোটাকতেক নৌকো কাত হয়ে পড়ে আছে।''

(পৃষ্ঠা - ৫৪)

''এক রাজা হাতি ঘোড়া লোক-লস্কর আর বন্ধ দু-তিনখানা পালকিসুদ্ধ আমার পাশে স্নানে নামলেন ...।''

মাসি ঃ

''... খেয়া নৌকো ধরে বসলেম গিয়ে ষষ্ঠিবাটার ভোজে।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৫)

কোটরা ঃ

''... কেউ একটা গোরুর গাড়িতে ভাঙা-চোরা ফুটো-ফাটা মাদুর, তক্তা, ময়লা কাঠের সিন্দুক, ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি বোঝাই করে চলেছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৬৭)

''মীরবহর ঘাটে বাঁধা নৌকোটা হচ্ছে মাচারুর ঘর-বাড়ি ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৬৮)

মারুতির পুঁথি ঃ

''... রাশি চক্কর ফিরছে মাথায় পড়ে, গরুর গাড়ির চাকার মতো ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৬)

''নুনের ভারে নৌকা ডুবিতে প্রাণে রক্ষা পেল বামুন।''

(পৃষ্ঠা - ৮৩)

লোক যাববাহন হিসাবে নৌকা, ডিঙি, পাল্‌কি, গরুর গাড়ি প্রভৃতির ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথের রচনায় মেলে। স্থলপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে মানুষ পাল্‌কি, গুরুর গাড়ি, ঠেলা গাড়ির উপর নির্ভর করত। আর জলপথে তাদের ভরসা ছিল নৌকা, কলার ভেলা, ডিঙির মতো জলযান।

—০—

তথ্যসূত্র

আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৫, ৩৭।

জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৬৪, ১৮০।

শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৪।

ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৪৩।

নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৬২।

আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভভন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩৫।

খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৯১। ৯৬।

বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৯৮,২১৫।

বাদশাহী গল্প, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২৯১।

সিকস্তি পয়স্তি কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪০০।

পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৪, ৪৯, ৫৪, ৭৪।

মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৩৫।

কোটরা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৬৭-১৬৮।

মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২৬, ৮৩।

—০—

লোক শিল্প

আপন কথা ঃ

''... কিন্তু ছেঁড়া মাদুর নয়তো মাটিতে বসে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৯)

''... কেউ কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১০)

''... উঁচু খাটে উঠতে পারা যাবে কি না ...।''

(পৃষ্ঠা - ১১)

''... আর তালপাতার পাখা নিয়ে মশা তাড়াত ...।'

(পৃষ্ঠা - ১১)

''কাজেই বোধ হচ্ছে উঁচু পালঙ্কে শোয়া সেই আমার প্রথম ...।''

(পৃষ্ঠা - ১২)

''হলদে রঙের বড়ো বড়ো কাঠের দরজা সারি সারি সবকটাই বন্ধ হয়ে গেছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৯)

''... ভিস্তি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ফেটি বেঁধে দু-হাতে দুই ঝাঁটা নিয়ে দেখা দিতে একটা মানুষ ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৩)

''... ছোট্ট যেন একটি মাটির পুতুলের মতো বেঁটে খাটো মানুষটি ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৪)

''ওদিকে নহবতখানার ছাতে বসেছে তখন আমাদের সময়ের কোচম্যানের মজলিস দড়ির খাটিয়া পেতে ...।''

(পৃষা - ২৬)

''... কাঠের পালকি, মাটির জগন্নাথ, সোনার ময়ূর ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৭)

''... ডাক্তারবাবু ভালো মানুষের মতো এসে একখানা বেতের চৌকিতে বসতেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৯)

''... তারই একপাশে সারি সারি মাটির উনুন গাঁথা আছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৫২)

জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ

''আঃ হাঃ, আবার আমার পুতুল গড়বার হাতুড়ি বাটালি নিয়ে টানাটানি কর কেন? ...''

(পৃষ্ঠা - ১৭৫)

''... বাগানের বাইরেই কুমোর বাড়ি চাকা ঘুরছে, সঙ্গে সঙ্গে খুরি গেলাস তৈরি হচ্ছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৭৯)

''... সেই তক্তার উপরেই মাদুর বালিশ বিছিয়ে তারা ঘুমোয় ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৮৩)

''... একটা গোল মাটির গামলা বসিয়ে তাতে জল ভরে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৯৫)

''... দেখো একটা কাঠের চৌকি চৌতলার ছাদের উপরে পাঠিয়ে দিয়ো দেখিনি চাকরদের দিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৪৮)

ক্ষীরের পুতুল ঃ

''... শুতে দিয়েছেন — ছেঁড়া কাঁথা।''

(পৃষ্ঠা - ২৭)

''রাণী ভাঙা পিঁড়েয় বানরকে খাওয়াতে বসলেন।''

(পৃষ্ঠা - ৩৬)

আলোর ফুলকি ঃ

''... মনে মনে এই তর্ক-বিতর্ক করতে করতে বুক ফুলিয়ে কুঁকড়ো ধানের মরাইটার চারিদিকে পা-চালি করছেন ...।''

(পৃষ্ঠ - ১২)

''... দোলনা চৌকি, চানের টব, বনে এসব পাই কোথা, বলো তে দিদি।''

(পৃষ্ঠা - ১৫)

''... আর যে কাঠের বাক্সটায় সোনালিয়াকে লুকিয়ে রেখে তম্মার চোখে ধুলো দিয়েছিলেন সেই দুটো জিনিস দেখিয়ে বললেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ২০)

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

''... আর হাতেও কিছু জমে — মাটির পুতুলটা, রাঙা চুড়িটা ...।''

(পৃষ্ঠা - ৮২)

''... তিনি কুকুরটাকে চিঠি বইতে বাজার থেকে মাছের খালুই মুখে করে আনতে আর সন্ধ্যেবেলা চক্কোত্তিমশায়ের বাড়িতে দাবা খেলে যাবার সময় লণ্ঠন নিয়ে যেতে শিখিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৮৪)

''... সেই সময় অন্ধকার করা ঘরটিতে ছেলে-মেয়ে তিনটিকে ঘুম পাড়িয়ে সোনার মা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৯৫)

বুড়ো আংলা ঃ

''... ঢেঁকিশাল, ধানের মরাই, আর এতটুকু সেই পুকুর ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৪৬)

''... রিদয় আকাশ থেকে দেখছে যেন সবুজ-হলদে-রাঙা-মেটে-নীল এমন পাঁচ রঙের ছক কাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৫৪)

''... সেই গর্তে খান দুই পুরোনো হোগলা পাতার মাদুর বিছানো ...।''

(পৃষ্ঠা - ২৩৫)

বাদশাহী গল্প ঃ

''একটা কাঠের ঘোড়া কিনে বেরিয়ে পড়লে না কেন দাদামশায়, কিম্বা মশার পিঠে চড়ে?''

(পৃষ্ঠ - ২৯১)

''রাতে চারখানা কাঠের চৌকির হাতায় মশারি বেঁধে বৈঠকখানার মাঝের ঘরে মাদুরের উপর তোষক পেতে দিত ফরাশ ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩১৩)

পথে বিপথে ঃ

''... নদীর মাঝে ময়লা কুয়াশা গত শীতের ছেঁড়া কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৬৪)

মাসি ঃ

''... তক্তার পরে চাঁইগুলো তালপাতার পাখা চালেন আর বলেন, পাখিগুলি কী বলছে বলো তো, অবুদাদা।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৪)

মারুতির পুঁথি ঃ

''... ছেলের প্রাণ কাঁদে মাটির হাতি নিয়ে খেলতে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৮)

রাসধারী ঃ

''নুলো — মাটির পুতুল গড়ে হাটে বেচতুম, চাষ করতুম।''

(পৃষ্ঠা - ৩৪৯)

''নুলো — ঘটি তো নেই। এই মাটির ভাঁড় আছে।''

(পৃষ্ঠা - ৩৪৯)

''... কত লোক ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে থাকে ...।'

(পৃষ্ঠা - ৩৫০)

উড়নচণ্ডীর পালা ঃ

''সং, পার তো দুখানা তালপাতার পাখা পিঠে বেঁধে আগে ঐ উই ঢিপিটা থেকে আকাশবাগে উড়তে চেষ্টা করো।''

(পৃষ্ঠা - ৩৪)

ভূতপত্রীর যাত্রা ঃ

''সাহেব। কাঠের ঘোড়া মিলতে পারে — প্যালারাম দিখলাও হবি হর্স!''

(পৃষ্ঠা - ১০৪)

কাকপক্ষীর পালা ঃ

''বৃন্দাবন। পাই কোথায় এমন মাটির ভাঁড়টা।''

(পৃষ্ঠা - ২৯২)

ঘোড়া হাটের পালা ঃ

''মোড়াতে বসে ওমেশ মণ্ডল।''

(পৃষ্ঠা - ৩২৩)

—০—

তথ্যসূত্র

আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃঃ ১১, ১৯, ২৩-২৭, ৪৯-৫২।

জোড়াসাঁকার ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃঃ ১৭৫-১৭৯, ১৮৩, ১৯৫, ১৪৮।

ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৭, ৩৬।

আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১২-১৫, ২০।

খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৮২-৮৪, ৯৫।

বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৪৬, ১৫৪, ২৩৫।

বাদশাহী গল্প, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ পৃঃ ২৯১, ৩১৩।

পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৬৪।

মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৩৪।

মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১৮।

রাসধারী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩৪৯-৩৫০।

উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৩৪।

ভূতপত্রীর যাত্রা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২৯২, ৩২৩।

—০—

লোকমাপজোখ বা পরিমাপ

আপনা কথা ঃ

"... এক-পলা করে তেল বিনামূল্যে দেওয়ানের কথা যেমন পলিশম্যান গোবিন্দকে বলা ...।"

(পৃষ্ঠা - ২৬)

"... সোনালি পুঁতির উপরে ফিরোজার ফুল বসানো ছোট্ট বালা দুগাছি, সোনার বালার চেয়েও ঢের সুন্দর দেখতে।"

(পৃষ্ঠা - ৪৬)

ভুতপতরীর দেশ ঃ

"কি, আমি থাকতে ডাকাতি? রাম সিং, আমায় এক ছিলিম তামাক দাও ...।"

(পৃষ্ঠা - ২২২)

কারিগর ও বাজিকর ঃ

"... সঙ্গে পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা তাল ঠুকে ডিগবাজি করে যেন সভা চমকে তুললে।"

(পৃষ্ঠা - ৩২৮)

ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা ঃ

"সে কেমন করে দশগণ্ডা বাঘ মারলে?"

(পৃষ্ঠা - ৩৪১)

আলোর ফুলকি ঃ

"সোনালিয়ার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কয়ে আরাম পাওয়া যায় ...।"

(পৃষ্ঠা - ২২)

"... একটু পরেই অন্ধকার থেকে তিনটে পেঁচা আগুনের মতো তিন জোড়া চোখ খুলে সুট করে দেখা দিলে ...।"

(পৃষ্ঠা - ২৪)

"কুকড়ো বললেন, দুকুড়ি দশটা মুরগির বাচ্ছা ফুটেছে?"

(পৃষ্ঠা - ১১)

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

"... দিনে চার ছটাক — এই পাওয়া গেল মেয়েটার জন্যে মোটের উপর তিনবেলায় তিন পোয়া দুধ ...।"

(পৃষ্ঠা - ৮২)

"সোনতন অমনি বললে, তিনসের ধানের চিঁড়ে কুটলেম মেয়ের কাজেতে।"

(পৃষ্ঠা - ৮৩)

"... মোজা ষোলো আনা ভর্তি দেখে তাঁর আর হাসি ধরে না ...।"

(পৃষ্ঠা - ১০৯)

"... তোমরা জনপিছু রোজ দেড় পাই হিসেবে মজুরি পাবে।"

(পৃষ্ঠা - ১১১)

"... রাখালের বৌকে রোজ একসের চালের ভাত দিও, গরুও দুধ দেবে।"

(পৃষ্ঠা - ১১৩)

বাদশাহী গল্প ঃ

"... রোজ তিন মন করে লোহার পিরেক যদি খাওয়াতে পার তো রাজি আছি ...।"

(পৃষ্ঠা - ২৯২)

"... যদি আলুকাবলি খাওয়াতে পার সাড়ে বত্রিশ সের করে দু-বেলা তো এস ...।"

(পৃঠা - ২৯২)

"ঠাকুরদাদা লুচি খেয়ে গেলে কয় গণ্ডা?"

(পৃষ্ঠা - ৩০০)

"... যোগেশ মামা দেখি দুছিলিম দশছিলিম যা বরাদ্দ করে দেন আমি দেব ...।"

(পৃষ্ঠা - ৩৩৪)

পথে বিপথে ঃ

"... এই এক-টিপ সিদ্ধি মুখে ফেলে দাও ...।"

(পৃষ্ঠা - ৩২)

মাসি ঃ

"... ঘরটা চায়ের ক্যাবিন ডাকবাংলো মিলে দেড় ছটাক, পুরো একটা কিছু হতে পারে নি।"

(পৃষ্ঠা - ১২৮)

মারুতির পুঁথি ঃ

''মোট এক ডাণ্ডা হাতে মতং মুনিকে পোয়াটেক পথ প্রাতঃস্নানের পর আসতে দেখে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪২)

''প্রায় দেড় পোয়া ক্ষীর নষ্ট হয় দেখে চাঁইমশাই এক নিঃশ্বাসে কোনো রকমে চাটুক-গলায় ঢেলে পুঁথি জাগাতে চললে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৫০)

''রামকার্য করলে লোকমান ছাড়া লাভ নেই একপাই।''

(পৃষ্ঠা - ৮২)

চাঁইবুড়োর পুঁথি ঃ

''সাত ঢোক নর্দমার জল খেয়ে রাবণ মাঠ ময়দানে ভেঙে হু হু চলেছে মান্ধাতার সন্ধানে ...।''

''মহোদরী দু মুঠো মুড়ি দেও, খেয়ে যাই রাজসভা, বৃষ্টি নামল বলে।''

(পৃষ্ঠা - ১৭৯)

লম্বকর্ণ পালা ঃ

''... এক ছিলিম সেজে আন আমার জন্য।''

(পৃষ্ঠা - ১৩৯)

এস্‌পার ওস্‌পার ঃ

''... যদি আত্মারামের মুখে গ্রাস তপসী মাছ ভাজা দুই কড়ি, এখানে উড়ায়ে আনতে পারো।''

(পৃষ্ঠা ২২৪)

দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা ঃ

''ষোল জোড়া থাথ বসাইতে মাথার ঘাম পায়ে পড়িল।''

(পৃষ্ঠা - ২৮৩)

ঘোড়া-হাটের পালা ঃ

''নিলে ক্ষোয়া-ক্ষীর দেড় পোয়া।''

(পৃষ্ঠা - ৩২৩)

যাত্রাগানে রামায়ণ ঃ

''গুনতে দেবো ছপোন কড়ি-কুম্ভকর্ণে বহে যাই।''

(পৃষ্ঠা - ২১)

''একপোয়া করে তেল, চারটে করে পলতে।''

(পৃষ্ঠা - ৯৬)

''সেপাই, বুড়ন মণ্ডল লঙ্কার তেল চারপলা পুড়িয়েছে পিদুম জ্বালাতে ...।''

(পৃষ্ঠা - ১০১)

''সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়।''

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ঃ

''... দু-দণ্ডের জীবন ফুটল ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩)

লৌকিক সমাজে লোকমাপজোখ বা পরিমাপের ক্ষেত্রে নানা এককের ব্যবহার দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথও তাঁর রচনায় যার যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সময় নির্দেশ করতে পলক, দণ্ড, বস্তুধর্মী পরিমাপে ঝুড়ি, ডালা, পরিমাণের ক্ষেত্রে পলা, পাই, সের, ছটাক, মুঠো, পোয়া ইত্যাদির প্রয়োগ লৌকিক সমাজে চোখে পড়ে।

—০—

তথ্যসূত্র

আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভভন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৬, ৪৬।

ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২২২।

কারিগর ও বাজিকর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩২৮।

ভোম্বলদাসের কৈলাসযাত্রা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩৪১।

আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২২-২৪, ৬৬।

খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৮২-৮৩, ১০৯-১১৩।

বাদশাহী গল্প, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২৯২, ৩০০, ৩৩৪।

পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৩২।

মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১২৮।

মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৪২, ৫০, ৮২।

চাঁইবুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১২৮, ১৭৯।

লম্বকর্ণ পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৩৯।

এস্‌পার ওস্‌পার, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২২৪।

দুই পথিখ ও ভল্লুকের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২৮৩।

ঘোড়া-হাটের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৩২৩।

যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ২১, ৯৬, ১০১, ২৬৮।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অবনীন্দ রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ৩।

—০—

লোকনেশা

আপন কথা ঃ

''... চৌতলার ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াতে এবং তামাক খেতে বৃষ্টিতে ভিজতে।''

(পৃষ্ঠা - ১৮)

''... আর দুই পিসি পান-দোক্তা খেয়ে বলাবলি করছেন এমনি আর একটা আশ্বিনের ঝড়ের কথা।''

(পৃষ্ঠা - ১৯)

''... সিদ্ধি ঘোঁটার সময় ছিল আর একটা ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪০)

জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ

''... সকালবেলা মা পান সাজেন; মার কাছে গিয়ে পানের বোঁটা খায় ...।''

(পৃষ্ঠা - ১৬৬)

''... সময়মত তামাক বদলে বদলে দেয়। তার কাজই তাই।''

(পৃষ্ঠা - ১৮৪)

''... হরকরারা সব পান দিয়ে যাচ্ছে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩১৪)

আবহাওয়া ঃ

''... এখানে পাড়া-পড়শীরা এসে বসত, তামাক, গান-বাজনা, খোশ গল্প চলত ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩১৭)

রাজকাহিনী / পদ্মিনী ঃ

''... পানগুলোও তেমনি পুরু, তামাকটাও তেমনি কড়ুয়া।''

(পৃষ্ঠা - ৮৮)

হাম্বির ঃ

''পথের ধারে চটিতে বিশ্রাম করার মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে আড্ডা দেওয়া ...।''

(পৃষ্ঠা - ১০৯)

''হাম্বির ভারে-ভারে মহুয়ার কলসী দলে-দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ১১৮)

সংগ্রামসিংহ ঃ

''... সেই আনন্দের দিনে মীনারায় বড়ো-বড়ো মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে ...।''

ভূতপত্রীর দেশ ঃ

''রাম সিং, আমায় এক ছিলিম তামাক দাও আর তাঁতির সঙ্গে গিয়ে বেঁধে আনো সেই ব্যাঙ তিনটাকে ...।''

গঙ্গাফড়িং ঃ

''... আর গঙ্গাফড়িং শুকনো রামতুলসীর তলায় না পান হাওয়া, না পান খাওয়া ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩০৪)

হানাবাড়িরর কারখানা ঃ

''... নিত্য দুধের দিতে যোগনা, সাজতে তেনার মিঠে পান।''

(পৃষ্ঠা - ২৭৫)

বাদশাহী গল্প ঃ

''তখন খাননা তামাকটি ঠাকুর দাদা।''

(পৃষ্ঠা - ২৯৯)

''... কুত্তো সেটা মুখে নিয়ে খানিক এদাঁতে ওদাঁতে সুপুরীর মতো চিবিয়ে মাটিতে ফেলে লেজ নাড়তে নাড়তে একদিকে চলে গেল ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩০৩)

''কদিন এবাড়ি ওবাড়ি পান তামাক খেয়ে কাটালেম ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩৩৫)

একে তিন তিনে এক ঃ

''বলি শোন না, আমাকে তো ঠাকুরদাস তার নিজের ঘরে বসিয়ে বললে, পান খান। বিড়ি কি সিগারেটের নামও করলে না ...।''

''... ওঃ বলেই তিনি খানিক তামাক টানতে থাকলেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩৬২)

ইচ্ছাময়ী বটিকা ঃ

''... আছে শুধু পড়ে একটুখানি তামাকের গন্ধ আর মস্ত সাদা জাজিমখানা যতদূর টানা যেন

সাহারা মরুভূমি বা মাকুল ময়দান ...।''

''তাই একটু, আর <u>পানে</u> দেবার চুনের গুঁড়ো দাও একটু খাইয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩৭৭)

<u>ভবের হাটে হেতি হোতি ঃ</u>

''চিকি <u>সুপারি, পানবিড়ি,</u> ঢাল তলোয়ার তলপত্র চিড়ি।''

(পৃষ্ঠা - ৪১৩)

<u>হারজিত ঃ</u>

''... এইভাবে খব্‌রীর খবর রুটির গোছার সঙ্গে কমতে কমতে মিঠে <u>পান</u> এবং মিঠে কড়া <u>তামাকে</u> যখন এসে ঠেকল ...।''

<u>রতনমালার বিয়ে ঃ</u>

''... বলে রায়গিন্নি <u>পান</u> গালে ফেলে চলে যান চানে ...।''

<u>কলা বনের কলা ঃ</u>

''খাতাঞ্চিমশায়, বাঁধা পুকুরের ঘাটে বসে <u>তামুক</u> টানতে টানতে বললেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৪৩)

<u>পথে বিপথে ঃ</u>

''দাসো একবার <u>পানের</u> দাগ-ধরা লাল ঠোঁট দুটো কুঁচকে বললে 'সাধু? আমিই তো সাধু'।''

''... এই এক-টিপ <u>সিদ্ধি</u> মুখে ফেলে দাও ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩২)

''... এক বুড়ো নাখোদা নেওয়ারের এক খাটিয়ায় বসে <u>তামাক</u> টানছেন ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪৭)

''বলেই লোকটা উত্তরাপাড়াস্তর ঘাটে লাফিয়ে পড়ল, <u>গাঁজার</u> বিকট গন্ধে জাহাজ ভরে দিয়ে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৬৬)

<u>মাসি ঃ</u>

''সে খাওয়াত কপ্পুরকাঠি <u>পানের</u> দোনা।''

(পৃষ্ঠা - ১২৭)

<u>কোট্‌রা ঃ</u>

''...চামারু একবার আরবের কথা পাড়লে মাচারু <u>বিড়ি</u> ধরিয়ে বললে — 'হোগো ভাই, কাম

তো হোনে দেও!' ''

(পৃষ্ঠা - ১৭৬)

বারোয়ারি উপন্যাস ঃ

''... হারমোনিয়ামের বাক্স ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে ফুলুট বাজাতে-বাজাতে পান চিবোতে চিবোতে রৈরৈ করে চলল ...।''

মারুতির পুঁথি ঃ

''... হনু সেখান থেকে একগোছা গাঁজার আঁটি মুখে তুলে দিল।''

(পৃষ্ঠা - ৩৯)

''... ও কীরপানাথ! বলি, দুধ জ্বালা হল? এক বাটি চা দাও — তামাক পুড়ে গেল।''

(পৃষ্ঠা - ৫০)

চাঁইবুড়োর পুঁথি ঃ

''আর বড়ো কেউ এগোল না। কেবল তাম্রকূট পর্বতের ধুমপান্ দৈত্যের ছেলে কটা এল — তাম্বাক, তম্বাক, গুড়ুক, চরুট্, দোক্তা, ভেল্সা, পিকা! ...''

(পৃষ্ঠা - ১১৩)

মহাবীরের পুঁথি ঃ

''বাটা ভরে পান দিব আড়নে আড়ন — যে জন মারিবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।''

(পৃষ্ঠা - ২১৭)

''... কখনো যেন গরগড়ার তামুক খায় জল-হাতি ...।''

(পৃষ্ঠা - ২২৮)

''মশায়! গাঁজার পাতা খেয়ে হাদিয়ার নাকে ঢুকে হাঁচতে পারে নি ...।''

(পৃষ্ঠা - ২২৯)

শিব-সদাগর ঃ

''চাঁচি, মুচি — পানটি খেলে আরো মজা! হো-হো-হো — ''

(পৃষ্ঠা - ২৯৩)

রং-বেরং ঃ

''শচী — গাড়িতে আমার পানেরর ডিবেটা তুলে দে নন্দনী ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩০৩)

রাসধারী ঃ

''হুঁকোবরদার — (ডাবাহুঁকো বাড়িয়ে) তামুক দিয়েছি।''

(পৃষ্ঠা - ৩৫৪)

উড়নচণ্ডীর পালা ঃ

''এক আঁটি গঞ্জিকা, তাতে কিছু ভাঙ।''

(পৃষ্ঠা - ২৭)

মউর ছালের পালা ঃ

''হুঁকো কলকি পান সুপারি।''

(পৃষ্ঠা - ৬৭)

ভূতপ্ত্রীর যাত্রা ঃ

''পানটা আর চালতাতলায় আসতেন বা অবুনাথ।''

(পৃষ্ঠা - ৯৭)

লম্বকর্ণ পালা ঃ

''... আমাদের তিনি গাঁজার দিক দিয়েও যেতেন না ...।''

(পৃষ্ঠা - ১২৯)

''আড়ে আড়ে চায় এমনি তামাক খাবার বাই ...।''

''দোক্তার নেশায় ঘুম গেছে তার ঠাণ্ডাতে চটিয়া।''

হংসনাম ঃ

''বিড়ি ফুঁকো না খিলি খেও না —''

(পৃষ্ঠা - ১৭২)

''... আমরা একটু তামাক খেয়ে নিই।''

''আমি পান খাই এমন শুরু করো তো — এই সূত্র ধরে গেয়ে চলো।''

এস্পার ওস্পার ঃ

''... দাও আফিমের কৌটোটা আর দুটো পান।''

(পৃষ্ঠা - ২০৬)

''হয়। পান, বিড়ি সিগারেট?''

(পৃষ্ঠা - ২২৩)

''... এখন তামাকের দোকান খুলেছি।''

(পৃষ্ঠা - ২২৩)

পুতলীর পালা ঃ

''কাওরা যেথা তামাক খায় বামুন সেথা এসে।''

(পৃষ্ঠা - ৩০৩)

গোল্ডেন গুজ পালা ঃ

''... আমি তামাক খেয়ে নিই ...।''

(পৃষ্ঠা - ৩২১)

ঘোড়া-হাটের পালা ঃ

''দাদার বয়েসে খান না পান।''

(পৃষ্ঠা - ৩৩৫)

''মনের মাঝে দেখে বুঝো তামাক বড়ো মিষ্টি
দোক্তা গুড়ুক তামাকেতে রেখে দেছে ছিষ্টি।''

(পৃষ্ঠা - ৩৩৯)

দুঃসহ পালা ঃ

''... আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে গাঁজা, লাউ, ছাতিম প্রভৃতি আহার করে ...।''

(পৃষ্ঠা - ৪১৩)

যাত্রাগানে রামায়ণ ঃ

''পান খেতে চুন কোথা পায়।''

(পৃষ্ঠা - ৯)

''পান খাই সুপারি নাই, দোক্তা খাই তলব নাই। চুন খাই খয়ের নাই, হায় আমার তিন ছেলে কোলে নাই।''

''সর্ষে রসুনে ধরাই গাঁজা বড়োই অদ্ভুত।''

(পৃষ্ঠা - ৩১)

''দেশলাই খুঁটি চুলা জ্বালাই বিড়ি খাই নিমিষে দুটি।
খাই মেড়া পোড়া কয়লা খুঁটি।''

''মহুয়া খাইতে বড়োই রং —''

(পৃষ্ঠা - ১৬৯)

''চলো যাই কৈলাসে খাই গিয়ে সিদ্ধি।''

(পৃষ্ঠা - ২৫২)

লোক সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোকনেশা দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায়। যার মধ্যে পান, তামাক, বিড়ি, দোক্তা, সিদ্ধি, গাঁজা, সুপারি, তাড়ি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতিমা বিসর্জনের সময় 'সিদ্ধি' নামক পানীয়ের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নানান রচনায় এইসব লোকনেশা দ্রব্যের প্রসঙ্গক্রমে একাধিকবার ব্যবহার করে তাঁর সুবিস্তৃত লোকায়ত মানসিকতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লোকসংস্কৃতির ভাবধর্মী উপাদানগুলি অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কীভাবে ব্যবহার করেছেন, সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

—০—

তথ্যসূত্র

আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৮-১৯, ৪০।

জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৬৬, ১৮৪।

আমাদের সেকালের পুজো, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৩১৪।

আবহাওয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৩১৭।

রাজকাহিনী / পদ্মিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৮৮।

রাজকাহিনী / হাম্বির, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১০৯, ১১৮।

রাজকাহিনী / সংগ্রাম সিংহ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৬৫।

ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২২২।

গঙ্গাফড়িং, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩০৪।

হানাবাড়ির কারখানা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২৭৫।

বাদশাহী গল্প, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২৯৯, ৩০৩০, ৩৩৫।

একে তিন তিনে এক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩৬১-৩৬২।

ইচ্ছাময়ী বটিকা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩৭৩, ৩৭৭।

ভবের হাটে হেতি হোতি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪১৩।

হার জিত, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪২৫।

রতনমালার বিয়ে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৩৫।

কলাবনের কলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৪৩।

পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ২৬, ৩২, ৪৭, ৬৬।

মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১২৭।

বারোয়ারি উপন্যাস, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), জুন ১৯৭৯, পৃঃ ২০৬।

মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩৯, ৫০।

চাঁইবুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১১৩।

মহাবীরের পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২১৭, ২২৮-২২৯।

শিব-সদাগর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২৯৩।

রং-বেরং, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩০৩।

রাসধারী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩৫৪।

উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২৭।

মউরছালের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৬৭।

ভূতপত্রীর যাত্রা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৯৭।

লম্বকর্ণ পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১২৮, ১৩১।

হংসনামা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৭২, ১৭৬, ২০০।

এস্‌পার ওস্‌পার, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২০৬, ২২৩।

পুতলীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৩০৩।

গোল্ডেন গুজ পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৩২১।

ঘোড়া-হাটের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৩৩৫, ৩৩৯।

দুঃসহ পালা অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৪১৩।

যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ৯-১০, ৩১, ১৬৯,২৫২।

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় ভাবধর্মী লোকসংস্কৃতির উপাদান

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতির উপাদানের ব্যবহার যেমন দেখা যায়, একই ভাবে ভাবধর্মী লোকসংস্কৃতির উপাদানের ব্যবহারও চোখে পড়ে। তাঁর রচনায় লোকসংস্কৃতির ভাবধর্মী উপাদানগুলি কীভাবে এসেছে তা নিম্নে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ঃ

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ভাবধর্মী লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান। সমাজে মানুষের জীবনযাত্রায় এই উপাদানটি নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় এই উপাদানটির নানাভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

ক্ষীরের পুতুল ঃ

এটি একটি রূপকথাধর্মী রচনা। রাজ্যে রাজার দুয়োরাণীর বড়োই অনাদর। পুত্র না হওয়ায় রাজার ভালোবাসা থেকেও সে বঞ্চিত। তারপর একদিন রাজারই এনে দেওয়া এক বানর রাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে সে তার সমস্ত দুঃখ দূর করে দেবে। তখন রাণী বলে চলে —

''বানরের কথায় রাণীর চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রাণী কেঁদে হেসে বললেন — ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কী তপস্যা করে, কোন দেবাতর বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরাণী করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি?''[১]

দেবতার কাছে বলি, তীর্থে তীর্থে পুজো দিলে যে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, উক্ত বিশ্বাস-সংস্কারটিই আলোচ্য অংশে ফুটে উঠেছে।

''এমনি করে নিত্য নতুন আমোদে দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেলে।''[২]

বানরের মুখে রাণীর ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে রাজা মন্দিরে পূজা, বলি দিয়ে বেড়ায়। এখানেও বিশ্বাস-সংস্কার ঠাঁই পেয়েছে। মা ষষ্ঠীর কৃপা হলে সন্তান লাভ হয় লোকসমাজে এমন ধারণা প্রচলিত আছে। 'ক্ষীরের পুতুল' -এর এক অংশে বানরের কথায় তার প্রকাশ পেয়েছে —

''বানর বললে — রাজাকে পাব কোথা? দুদিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বড়ো

অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস ষেঠের বাছা কোলে পাবি।''[৩]

'রাজকাহিনী' / 'শিলাদিত্য' ঃ

'রাজকাহিনী'-র 'শিলাদিত্য' অংশে ব্রাহ্মণ কণ্যা সুভাগা মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে তার জীবনের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে বলে —

''প্রভু, আমি আশ্রয় চাই, ব্রাহ্মণ কন্যা, গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা; বিয়ের রাতে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগী বলে সকলে মিলে আমায় আমাদের দেশের বাইরে করেছে।''[৪]

বিয়ের রাতে বিধবা হলে সেই মেয়েটিকে সুলক্ষণা বলে লোক সমাজ মান্যতা দেয় না। এই অংশেও সমাজের উক্ত বিশ্বাস-সংস্কার এর প্রতিফলন ঘটেছে। মেয়েটিকে তার ঘরছাড়া হতে হয়।

গোহ ঃ

''পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার মতো বিঁধে গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ-ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গম্ভীর করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেলল।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল; তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন — 'মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সর্বনাশ ঘটল!' ''[৫]

আচমকা রক্তপাত মানুষের মনে কোনো বিপদের সংকেত বয়ে আনে। তাই চাদরে উপর তার হাত থেকে পড়া এক ফোঁটা রক্ত দেখে স্বামী শিলাদিত্যের কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কায় তার প্রাণ কেঁপে উঠেছে

শিলাদিত্য মারা যাওয়ার পর রাণী পুষ্পবতী বাল্যসখী কমলাবতীর হাতে তাঁর পুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বললেন —

''প্রিয় সখী, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মতো একে মানুষ কোরো। ... আর ভাই, যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই একমুঠো ছাই কার্তিক পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও - যেন আমাকে জন্মান্তরে আর বিধবা না হতে হয়।''[৬]

মৃত্যুর পর ছাইভস্ম গঙ্গার জলে দিয়ে এলে পরজন্মে আর অকাল বৈধব্য ঘটবে না, এমন বিশ্বাস - সংস্কারেরই প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য অংশে।

পদ্মিনী ঃ

''ভীমসিংহ আরও বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রাণা-রাণীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রানার হাত ধরে নেমে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল - একী অলক্ষণ! একী অলক্ষণ!''[৭]

কাক বা পেঁচার ডাক লোকসমাজে অমঙ্গলের বার্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই ডাক তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে।

সংগ্রামসিংহ ঃ

''সঙ্গ, তিনি সবার বড়ো একটুখানি হেসে বললেন, 'ভবানীমাতা যাকে সিংহাসন দেরার দিয়ে বসে আছেন, বিশ্বাস না হয়, চল চারনীদেবীর মন্দিরে গুনিয়ে দেখি কার অদৃষ্টে সিংহাসন লেখা রয়েছে।''[৮]

জন্মের সময় থেকে দেবতা মানুষের ভাগ্যফল যেমন নির্ধারণ করে দেন, পরবর্তী সময়ে জীবন সেই ভাবেই এগিয়ে চলে। এমন বিশ্বাস সংস্কার মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এছাড়া গুনোনোর উপরেও তাদের আস্থা দেখা যায়।

ভুতপত্রীর দেশ ঃ

এই গল্পে কথক মাসির বাড়িতে মোয়া খেয়ে পালকিতে করে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে চলেছে পিসির বাড়ি। তারপরেই কাহিনীতে এসেছে ভূতেদের প্রসঙ্গ। ''খানিক পর জেগে দেখি, সেই মনসাতলার লণ্ঠন-ভূতটা আর তার চার বন্ধু আলো নিয়ে আমার মুখের কাছে বসে আছে। 'তবে রে।' বলেই যেমন উঠতে যাব অমনি তারা বলে উঠেছে, 'দেখো বাবু, ফের যদি লাঠি দেখাও কি মারতে আস, তবে আবার আমরা তোমাকে ফেলে পালাব। আর যদি চুপ করে ভালো মানুষটি হয়ে পাল্‌কিতে বসে থাক,

তবে ওই কি বলে ও-কি তলা পর্যন্ত তোমাকে আমরা পৌঁছে দেব।' বুঝলুম ভূতগুলো ভয়ে রামনাম মুখে আনতে পারছে না, তাই পিসির বাড়ি যেতে যে রামচণ্ডীতলার কথা শুনেছি তাকে বলছে - কি বলে ও-কি তলা।''[৯]

রাম নাম মুখে নিলে ভূত প্রেত মানুষের কাছে ঘেঁষতে পারে না — এমন বিশ্বাস-সংস্কার লোকসমাজে দেখতে পাওয়া যায়।

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

''সোনার মায়ের সেইদিন থেকে ধুকপুকনি জাগল। পুতু যদি ভূত হয়, তবে তো এইবেলা রোজা ডাকা ভালো। তিনি খাতাঞ্চিমশাইকে পুতুর কথা একদিন বললেন।''[১০]

... কোনো ছেলে বা মেয়ে শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে ভুল বকতে থাকলে গ্রামের অনেক মানুষ তখন বিশ্বাস করে কোন অশুভ শক্তি তাদের উপর ভর করেছে। তখন সেই অশুভ শক্তির (ভূত, প্রেত ইত্যাদি) হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গ্রামীণ ওঝা বা গুণীন এর ডাক পড়ে। এমন বিশ্বাস-সংস্কার সমাজে ছড়িয়ে আছে। আলোচ্য অংশে সোনার মায়ের কথাবার্তার মধ্যে সেই বিশ্বাস-সংস্কারেরই আভাস মেলে।

বুড়ো আংলা ঃ

''লক্ষ্মীপুজোর দিন রিদয়ের মা এই সিন্দুককে সিঁদুরের ফোঁটা, ধানের শীষ দিয়ে সাজিয়ে পুজো করে, ঢিপঢিপ প্রণাম করে কতবার রিদয়কে বলেছেন — 'দেখিস, সিন্দুকে পা ঠেকাসনে, ওতে লক্ষ্মী আছেন!''[১১]

ভয় ও ভক্তি থেকে মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করে। রিদয়ের মা এর কথার মধ্য দিয়ে সেই ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে। ''রিদয় পাখিদের কাছে, পশুদের কাছে দাবড়ি খেয়ে ঢিট হয়ে গিয়েছিল, এবার সে খুব ভদ্রতা করে উত্তর দিলে — 'আজ্ঞে, আমি কৈলাস পর্বতে শ্রীশ্রী গণেশ ঠাকুররের ছি-চরণে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' গুগলী উত্তর করলে — 'আমি গঙ্গা সাগরে ছান কত্তি যেতেছি।' ''[১২]

গঙ্গা সাগরে স্নান করলে জীবন অনেক পূণ্য অর্জন করা যায় এমন বিশ্বাস লোকায়ত সমাজে লক্ষ্য করা যায়।

আলোর ফুলকি ঃ

''কুটুরে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'তারও উপায় করা গেছে। যে পাহাড়ী ছোঁড়াটা খাঁচা

খুলে সকালে তাদের দানাপানি খাওয়ায় সে কাল যেমন খাঁচা খুলবে আর আমি অমনি তার মুখে গিয়ে ডানার এক ঝাপটা দেব। নিশ্চয়ই সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড় দেবে খাঁচা খোলা রেখে। পেঁচার বাতাস গায়ে লাগলেই অসুখ, সেটা জানো তো। তারপর সব মোরগকে নিয়ে সরে পড়ো আর কি?' ''[১৩]

পেঁচার ডাককে মানুষ অসুভ বলে মনে করে। শুধু তাই নয় পেঁচার ডানার বাতাস গায়ে লাগলেও শরীরের কোনো ক্ষতি হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে।

টুকরি বুড়ি ঃ

''ছেলের কান্নায় পাড়ার লোক অস্থির। — 'বলি ও ছেলের মা, তোমার ছেলেকে হয় দানায় পেয়েছে, না তো কিছু রোগ ধরেছ বাপু! নজ্জুম ডাকাও, হাকিম আনাও, ঝাড়-ফোঁক করাও, দাবাই পেলাক, ছেলে ঘুমাক, পাড়া জুড়াক।' ''[১৪]

বাচ্চা ছেলে অত্যধিক কান্নাকাটি করলে তাকে কোনো অশুভ শক্তি ভর করেছে বলে সমাজে মানুষ বিশ্বাস করে। তখন তা থেকে উদ্ধার পেতে তারা হাকিম, ওঝা, গুণিনের স্মরণাপন্ন হয়।

রতনমালার বিয়ে ঃ

''রতনমালার বিয়ে হওয়া দায়! কলম্বানেবুর গন্ধের জ্বালায় দুই ভাই দেশ ছাড়া হয়েছে। রতনমালাটাও বুঝি যায়! পীরের সিন্নি দিলে যদি রক্ষা পায় এ যাত্রা।

— পরের কথা পরে ভাবা যাবে — বলে রায়গিন্নি পান গালে ফেলে চলে যান চানে। রায়মশায় পীরের মানত করেন মনে মনে।''[১৫]

পীরকে সিন্নি দিলে বা পীরের কাছে মানত করলে আসন্ন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এমন বিশ্বাস-সংস্কার লোকসমাজে প্রচলিত আছে।

''তাও কী হয় গা, হাত মুখ ধোও, মিষ্টিমুখ কর। যেমন এলে তেমনি কে যেতে আছে!''[১৬]

কোনো অতিথি বাড়িতে এলে তাকে কিছু না খাইয়ে বিদায় করতে নেই। এতে গৃহের অমঙ্গল সাধন হয়। এমনতর বিশ্বাস লোকায়ত সমাজে দেখা যায়।

মাসি ঃ

অবনীন্দ্রনাথ যখন জোড়াসাঁকোর ৫নং বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে গুপ্ত নিবাসে বসবাস শুরু করেন, তখন তিনি এই গল্পটি লেখেন। ৫নং বাড়ি ছেড়ে আমার যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় কল্পনায় মাসির কাছে এসে সান্ত্বনা খুঁজেছে। অবু মাসিকে বলছে —

''বোধ আর হবে কী, মাসি। দেখে শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। সেখানটা যেন এখানে কে এনে বসিয়ে দিয়েছে। সেই পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে সারি সারি নারকেল গাছ, সেই ভুতুড়ি-কাঁঠালি, সেই তেঁতুল, সেই পাতবাদাম — সবই যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে যে যার জায়গায়। ... নিশ্চয় তুমি ডাক-মন্তর জান, মাসি। ডাক-মন্তরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সবাই, এতে আর সন্দেহ নেই।' ''[১৭]

মন্ত্রের শক্তির উপর বিশ্বাস মানুষের বহুদিনের। এর দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন করা যায় বলে মানুষ বিশ্বাস করে। উপরোক্ত অংশেও অবুর মধ্যে সেই বিশ্বাসেরই পরিচয় মেলে।

'' 'মন্তরের মানে ভাঙতে সেই দাদা, গুরুর নিষেধ আছে।' বলে গামছা নিঙরোতে নিঙরোতে চলেন আর হাঁক পাড়েন বুড়ো, 'রান্না হল গো? আর কত দেরী? একবাটি ঘি বেশি দিয়ো অবুবাবুকে।' ''[১৮]

গুরুর কাছ থেকে যে মন্ত্রের শিক্ষা নেওয়া হয়, তার মানে ভাঙতে নিষেধ থাকে। মন্ত্রের মানে ভাঙলে তার কার্যকারীতা থাকে না বলে বিশ্বাস করা হয়। আবার গুরুর নিষেধ লঙ্ঘন করাও শিষ্যের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

চাঁইবুড়োর পুঁথি ঃ

''মহাশক্তিমান মহামান্যমান
শমন-দমন রাবণ রাজা করতেছেন অভয় দান।
আমরা লঙ্কাবাসী,
পরলোকের শঙ্কা না বাসি,
ইহলোকেই খাই দাই ভুড়ি বাজাই - বাজাই কাঁশি।''[১৯]

ইহলোকে ভালো কাজ করলে পরলোকে সুখ ভোগ করা যায় বলে মানুষ বিশ্বাস করে থাকে। এ একপ্রকার পাপ-পুণ্যের ভয় দেখিয়ে মানুষকে সঠিক পথে চালনা করবার প্রয়াস।

''তখন মধুরায় মধুরায়
আরামে নিদ্রা যায়,
দড়ার খাটিয়ায় দেদার ছাড় খিলায়।
মর্কটি মথুরাবাসী উকুন বাছে বসি,
কুম্ভীনামী মাথা ঘসি চুল আঁচড়ায়।
বলেই চাঁইবুড়ো মধুসূদন মধুসূদন বলতে বলতে আসর ত্যাগ করে মাথা ঘষার গলিতে বারোয়ারি সভায় প্রস্থান।''[২০]

মধুসূদন এর নাম নিলে সকল আগত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বা বিপদ আসবে না,

এমন বিশ্বাস অনেকেই করে থাকেন।

রাবণের দুই স্ত্রী শেল ও শক্তি রাবণকে এসে জানায় তারা তাদের ভাই যমকে ভাইফোঁটা দিতে চাই। তখন রাবণ যমের বাড়ি কোন দিকে ত্রিজটীর কাছে জানতে চাইলে ত্রিজটী ঘটি চেলে মন্ত্রর পেড়ে রাবণকে তা জানায় —

''ত্রিজটি এসে ঘটি চালা শুরু করলে মন্ত্র পড়ে ঃ

'যমের ডাঙ্গস, শিবের তিরশূল, বিষ্ণুর গদা

কোনটা সামলায় তিরজটা!

অমনি ঘটি চলতে থাকল —

নোনা জলে মিঠে জলে,

পুবে পশ্চিমে উত্তরে।

হাট নিশুতি বাট নিশুতি,

ঘটি চলে গুটি গুটি।

হয়ে নিশুতির বাট

ঘটি এল দক্ষিণ পাট।

খাট না পৌঁছতে ঘাটে ঘটি হলেন আগুমার,

যেখানে করেন যম ধর্মের বিচার।

ঘটি বলেন, যম আছ নিরুদ্বেগে,

যমের যম রাবণ এসতেছে রেগে মেগে।

ঘটির বচনে যমের থরহরি কম্প

বলে, কে আছ রে দক্ষিণ দুয়ার করো বন্ধ।''[২১]

কোনো কিছু জানার জন্য বা হারনো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য ঘটি চালা, নল চালা ও তার সাথে মন্ত্র পড়া হয়ে থাকে। এসব করলে হারানো জিনিসের হদিস পাওয়া যাবে বলে মানুষ বিশ্বাস করে থাকে।

রাবণের সাজগোজ করতে দেখে কালনেমি রাবণ যুদ্ধ করতে যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে রাবণ বলে উঠে —

'' 'না মামা, তুমি এখন যাও। শনির মতো তোমারও শামলা মাথার মুখখানা দেখে যাত্রা করছিনে — আড়াল হও, পাতলা হও।' ''[২২]

অনেকেই বিশ্বাস করে যাত্রাকালে অমুক ব্যক্তির মুখ দেখে গেলে যাত্রা শুভ হবে না। তাই তার নাগাল থেকে দূরে থাকতে চায়। আলোচ্য অংশেও এই বিশ্বাস-সংস্কার এর ছায়াপাত পড়েছে।

কঞ্জুষের পালা ঃ

''কঞ্জুস । বাবা আমার দক্ষিণাবর্ত কড়ি এককড়ি অনেকদিন হলো বিবাগী হয়ে গেল, আর ফিরলো না, তার ভাল নাম ষষ্ঠীচরণ। বলতে পার কোথা সে আছে, দেখো তো খড়ি পেতে একবার।

সন্ন্যাসী । আমরা খড়ি কড়ি বরগা এসবের ধার ধারিনে, সাধু পুরুষদের ওসব চিন্তা করতে নেই। বাবা আসবে, ফিরে আসবে।''[২৩]

কোনো কিছু হারানো সামগ্রী ফিরে পেতে বা হারিয়ে যাওযা কারো হদিস করতে খড়ি পাতা হত। মানুষ বিশ্বাস করত খড়ি পেতে তার হদিস পাওয়া সম্ভব।

''কুঞ্জ । দেখলেন সট করে একটা সাদা সাপ।

সঞ্জি । চুপ চুপ বলো লতা লতা — বাস্তু লতা দেখছিস, তোর কপালে রাজত্ব আছে।''২৪

সাপকে লতা বলতে হয় এবং বাস্তুতে যে সাপ থাকে, তা ক্ষতি সাধন করে না মঙ্গল সাধন করে; এমন বিশ্বাস-সংস্কার লোকসমাজে প্রচলিত আছে।

ফসকান পালা ঃ

''প্রথম । ও সব বইবে কে ভাই বলো আর দেরি নয়, দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়ি চলো।

দ্বিতীয় । চলো, দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

প্রথম । নমো পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ।''[২৫]

কোথাও যাত্রা করবার আগে মানুষ দুগ্‌গা দুগ্‌গা নাম করে যাত্রা শুরু করে। তারা বিশ্বাস করে এর ফলে পথে বাধা-বিঘ্ন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

''(দ্বি)। কপালে যার যা আছে লেখা
সেটারে কে বা দেবা ঠেকা!
কাজেই চুপচুপ বসে থাকা
আমার মতেতে উচিত কয়।''[২৬]

জন্মের পর থেকে সারা জীবন ধরেই মানুষকে নানান দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আর

মানুষ বিশ্বাস করে সেইসব ঘটনা তাদের জন্মের সময় থেকেই কপালে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যা কোনো মতে খণ্ডাবার নয়।

যাত্রাগানে রামায়ণ ঃ

''দোহার । ... কুস্বপ্ন দেখেন যেন রাত্রি অবশেষে
চন্দ্র সূর্য খসি গেল সহসা আকাশে।
কুক্কুর আসিয়া আগে করিছে ক্রন্দন
রোদন করিছে মন্দুরায় অশ্বগণ।
পেচক ডাকয়ে বসি ধ্বজার আগেতে
অনল না জ্বলে যেন ঘৃত প্রদানেতে।''[২৭]

কুকুরের ক্রন্দন, রাত্রিতে পেঁচার ডাক কোন অশুভ বার্তা বয়ে আনে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। আলোচ্য অংশে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

''রাম । অসময়ে শৃগালের দল বার বার
রুক্ষস্বরে ঘোরতর করিল চিৎকার।
বাম চক্ষু হইছে স্পন্দিত সদাই
ইথে যেন বোধ হয় সীতা যেন নাই।
লক্ষ্মণ! সীতারে রাখি একাকী তোমার
আসা ভালো হয় নাই বিচারে আমার।''[২৮]

ছেলেদের বাম চোখ ও মেয়েদের ডান চোখ স্পন্দিত হলে তা খারাপ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। তাই বাম চক্ষুর কম্পন দেখে রামচন্দ্রের মনে হয়েছে পঞ্চবটী বনে একাকী সীতার হয়তো কোনো বিপদ হয়েছে।

—০—

তথ্যসূত্র

১) ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩৪।

২) তদেব, পৃঃ ৪১।

৩) তদেব, পৃঃ ৪২।

৪) রাজকাহিনী, শিলাদিত্য, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৫০।

৫) রাজকাহিনী, গোহ, তদেব পৃঃ ৬০-৬১।

৬) তদেব, পৃঃ ৬২।

৭) রাজকাহিনী, পদ্মিনী, তদেব, পৃঃ ৮৬।

৮) রাজকাহিনী, সংগ্রাম সিংহ, তদেব, পৃঃ ১৫৯।

৯) ভুতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৮৪।

১০) খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৯৩।

১১) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৩৮।

১২) তদেব, পৃঃ ১৪৮।

১৩) আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩১।

১৪) টুকরি বুড়ি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪২৬।

১৫) রতনমালার বিয়ে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ পৃঃ ৪৩৫।

১৬) তদেব, পৃঃ ৪৩৬।

১৭) মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১২২।

১৮) তদেব, পৃঃ ১৩৪।

১৯) চাঁইবুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১০১।

২০) তদেব, পৃঃ ১৪৩।

২১) তদেব, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

২২) তদেব, পৃঃ ১৮২।

২৩) কঞ্জুষের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৬৫।

২৪) তদেব, পৃঃ ৬৯।

২৫) ফসকান পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২৭৭।

২৬) তদেব, পৃঃ ২৮১।

২৭) যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী, (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ১১৫।

২৮) তদেব, পৃঃ ১৩৪।

—০—

রূপকথা

শকুন্তলা ঃ

বাল্যগ্রন্থাবলীর অভাব মোচনের জন্য অবনীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' বইখানা লেখেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক ও মহাভারত থেকে তিনি এর কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। গল্পটি রূপকথার আদলে লেখা। পুরোপুরি রূপকথা হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু এই গল্পে এসেছে রূপকথার নানা প্রসঙ্গ । তাই গল্পটি যত এগিয়েছে ততই আমরা দেখি শকুন্তলার দুঃখ মোচনের কাহিনী। গল্পটি শুরুই হয়েছে রূপকথার ঢঙে।

''এক নিবিড় অরণ্য ছিল, তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট, সারি সারি তাল, তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল ছোটো নদী মালিনী। ... নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলে জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো শিশু, কুশের বনে ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল পরা কতগুলি ঋষিকুমার।''[১]

এইভাবে গল্পের শুরুতেই লেখক তাঁর বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমাদের পৌঁছে দেন রূপকথার জগতে। রূপকথার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় একই শব্দ বা সংখ্যার পুনপুনঃ ব্যবহার। আমরা এই বৈশিষ্ট্যের নমুনা 'শকুন্তলা' গল্পেও পাই — ''যে দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল দুষ্মন্ত।

সেকালে এত বড়ো রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুব-দেশের রাজা, পশ্চিম দেশের রাজা, উত্তর দেশের রাজা, দক্ষিণ দেশের রাজা, সব রাজার রাজ্য ছিলেন। সাত সমুদ্র তের নদী — সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা - রাজা দুষ্মন্ত।

... যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল, সেই দিন সাত সমুদ্র তের নদীর রাজা, রজা দুষ্মন্ত, প্রিয় সখা মাধব্যকে বললেন — 'চল বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।' ''[২]

আলোচ্য অংশে আমরা দেখতে পাই 'রাজা' আর 'রাজ্যে'র বারবার ব্যবহার, যা রূপকথার

মায়াজগৎ রচনা করতে সাহায্য করেছে।

তারপর রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়া করতে এসে কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ, শকুন্তলার সাথে সাক্ষাৎ ও বিবাহ, তারপর দেশে ফিরে যাওয়া ও ঋষির অভিশাপে শচীতীর্থে আংটি হারিয়ে দিয়ে রাজাকে তা দেখাতে না পেরে রাজাকর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। এ যেন রূপকথার দুয়োরাণীর দুঃখের জীবন ইতিহাস। এর কিছু পরেই রুই মাছের পেট থেকে পাওয়া সেই অংটি জেলের কাছ থেকে পেয়ে রাজার শকুন্তলার কথা স্মরণে আসা। বাংলা লোককথার মোটিফ ইনডেক্স এ এন ২১১.১ তে মাছের পেটে হারানো আংটি প্রসঙ্গটি মেলে।

স্বর্গপুরে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফেরবার পথে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে নিজের ছেলের সঙ্গে দুষ্মন্তের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। পিতা-পুত্রের আকস্মিক সাক্ষাৎ এই বিষয়টি বাংলা লোককথার মোটিফ ইনডেক্স এ এন ৭৩১ অংশের অন্তর্গত।

রূপকথার পরিণতি হয় মিলনাত্মক। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটতে দেখা যায়। আলোচ্য 'শকুন্তলা'-তেও দেখা যায় সেই মিলনের প্রসঙ্গ —

''এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন। রাজা-রাণীতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল, দুর্বাসার শাপান্ত হল। কশ্যপ অদিতিকে প্রণাম করে রাজা-রাণী রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।''[৩]

এই ভাবে নায়ক-নায়িকার মিলনের মধ্য দিয়ে রচনাটির সমাপ্তি ঘটে।

ক্ষীরের পুতুল ঃ

এই রচনাটির কাহিনী তিনি মৃণালিনী দেবীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তার সাথে তিনি যোগ করেছিলেন নিজস্ব কথকতা। গল্পটি রূপকথার ঢঙে লেখা। গল্প শুরুই হয়েছে 'এক যে ছিল রাজা, এক যে ছিল রানী' এইভাবে —

''এক রাজার দুই রানী, দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানীর বড়ো আদর, বড়ো যত্ন। সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে দুওরানী মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুক ভরা সাত রাজার ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানী রাজার প্রাণ।

আর দুওরানী - বড়োরানী, তাঁর বড়ো অনাদর, বড়ো অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি

ঘর দিয়েছেন - ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন - বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন - ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।''[৪]

গল্পের শুরুতেই ফুটে উঠে দুই বিপরীত চিত্র। দুয়োরানীর দুঃখের শেষ নেই, আর সুয়োরানীর প্রভুত সুখ। এরপর রাজা দেশ ভ্রমণে গেলেন। ছোটোরানীর জন্য আনলেন মাণিকের চুড়ি, সোনার মল, চিকন শাড়ি। কিন্তু তাতেও রানীর মন ভরল না। আর বড়োরানীর জন্য আনলেন এক বনের বানর। যে কথা বলতে পারে। কথাবলা বানর প্রসঙ্গটি বাংলা লোককথার মোটিফ ইনডেক্স এ বি ২১১.২.১০ এর অন্তর্ভুক্ত। এই বানরই ক্রমে ক্রমে দুয়োরানীর দুঃখ দূর করলো। নানান কৌশলে মা ষষ্ঠীর কাছ থেকে ক্ষীরের পুতুলের পরিবর্তে সত্যিকারের ছেলে এনে দিয়ে দুয়োরানীর প্রতি রাজার ভালোবাসা পুনরায় ফিরিয়ে দিল। তারপর — ''রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতকু দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বৌকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশশো ভারি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল। হিংসেয় ছোটোরানী বুক ফেটে মরে গেল।''[৫]

রূপকথায় শুভ ও অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব দেখানো হয় এবং পরিশেষে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে শুভ শক্তিরই জয় ঘোষিত হয়। আলোচ্য গল্পেও তারই প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। গল্পের শেষে দুয়োরানী ও রাজার মিলন ঘটে। বাংলা লোককথার মোটিফ ইনডেক্স এল ৪৫১.৫ এ রাজার সঙ্গে দুয়োরানীর পুনর্মিলন প্রসঙ্গটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

<u>আলার ফুলকি ঃ</u>

'আলোর ফুলকি' পশু-পাখিদের নিয়ে লেখা গল্প। গল্পের নায়ক কুঁকড়ো। যে মনে করে তার ডাকেই অন্ধকার দূর হয়ে পাহাড়তলিতে আলো ফুটে উঠে। কিন্তু কোন মন্ত্রের দ্বারা সে একাজ করে দেখায়, তা কাউকে সে বলে না। তার চার স্ত্রী একথা জানতে চাইলেও তা সে এড়িয়ে যায়। কাহিনীর কিছু পরেই গল্পে উপস্থিত হয় সোনালিয়া পাখি। যাকে কুঁকড়োর ভালো লাগে, কিন্তু সোনালিয়াও তার কাছে এই খবর জানতে চাইলে সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নির্জন বনে সকালের সোনা আলোতে দাঁড়িয়ে সোনালিয়া কুঁকড়োকে পুনরায় সেই গোপন মন্ত্রের কথা জানতে চাইলে কুঁকড়ো ভাবনায় পড়ে যায়। আর তখনই সোনালিয়া রূপকথা বলা শুরু করে।

''সোনালিয়া মিঠে সুরে আরম্ভ করলে রূপকথা, 'এক যে ছিল কুঁকড়ো আর যে ছিল বনের টিয়া।' কুঁকড়ো ভুল ধরলেন, 'হল না তো হল না তো।' তারপর নিজেই রূপকথার খেই ধরলেন,

‘কুঁকড়োর পিয়া ছিল সোনালিয়া, বনবাসিনী বনের টিয়া।’ সোনালিয়া বলে উঠল, ‘কুঁকড়ো টিয়াকে কখনো বললে না রূপকথার নিতিটুকু’, বলতেই কুঁকড়ো সোনালিয়ার কাছে এসে বললেন, ‘জানো, সে কথাটা কী? সেটা বনের টিয়েকে কুঁকড়ো বলতে সময় পেলে না? কথাটা হচ্ছে, তোমার সোনার আঁচল বসন্তের বাতাস দিয়ে গেল সোনালিয়ার বনের টিয়া।’ সোনালি গম্ভীর হয়ে বললে, ‘কি বকছেন আপনি। রূপকথা শোনাতে হয় তো আপনার চার বউকে শোনান গিয়ে, খুশি হবে’, বলেই সোনালি অন্য দিকে চলে গেল।’’[৬]

বুড়ো আংলা ঃ

গণেশ ঠাকুরের অভিশাপে বক হয়ে আবার মানুষের রূপ পাবার আশায় গণেশের খোঁজে। রিদয় নামক এক ছেলের হাঁসের পিঠে চড়ে কৈলাসের পথে যাত্রা - ‘বুড়ো আংলা’ রচনার বিষয়। এই গল্পেরই এক অংশে এসেছে রূপকথা প্রসঙ্গের কথা —

‘‘রিদয়ের ইচ্ছে হাঁস সেদিকে না যায়, সে কেবলি তাকে ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খোঁড়ার মন পড়ে আছে সেই রূপকথার রাজকন্যার মতো সুন্দরী বালি হাঁসের দিকে, সে রিদয়কে নিয়ে একবার উত্তরমুখে উড়ল, কিন্তু খানিক পথ গিয়েই বললে — ‘ভাই, বড়ো মন কেমন করছে, মানস সরোবরের এই নাটবাড়ির চালায় দু-চারদিন কাটিয়ে চল বাড়ি মুখো হওয়া যাক, দেশে যাবার জন্যে মন টেনেছে আর ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছে না।’ ’’[৭]

এই গল্পের আর একস্থানে এসেছে রাজপুত্তুর, কোটাল পুত্তুরের প্রসঙ্গ, যার রূপকথায় দেখে মেলে — ‘‘বুদি গোয়ালের দুয়োর ছেড়ে একপাশ হল, তিন বন্ধুতে বাদলার রাতে গোয়ালে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটবার যোগাড় করতে চলেছেন, বুদিগাই লেজ নেড়ে বললে — ‘আর জন্মে কত তপিস্যি করেছি, তাই কাঙালিনীর ঘরে রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তুর আর কোটালের পুত্তুরের পা পড়ল।’ রিদয় খুশি হয়ে বুদির ঘাড়টা একটু চুলকে দিলে, তারপর খড়ের গাদায় শুয়ে তিন বন্ধুতে চোখ বুজলে।’’[৮]

মাসি ঃ

৫নং ঠাকুর বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর অবনীন্দ্রনাথ গুপ্ত নিবাস-এ এক বাগান বাড়িতে সপরিবারে চলে আসেন। এখানে এসেই তিনি ‘মাসি’ গল্পটি লেখেন। এখানে ব্যক্ত হয়েছে ৫নং বাড়ি ছেড়ে আসার যন্ত্রণা। এই গল্পেরই এক স্থানে অবু ও মাসির কথোপকথনে উঠে এসেছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির কথা। যা রূপকথায় দেখা মেলে —

‘‘পুকুর ঘাটে কাগাবগাকে,
পানকৌটিকে, বেনেবউটিকে,

শোলার ঝারাতে টুনটুনি পাখিকে,
ঝুমঝুমি-গাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির কথা শুনিয়েছিল।
এমনি সব তারা কোন্ দেশ হতে
এসেছিল, মাসি?''[৯]

রং-বেরং ঃ

এই নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে একাধিক পাখির সঙ্গে এসেছে বেঙ্গামা-বেঙ্গমীর কথা। রূপকথার গল্পে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

''কুকুর - রও। গোল কোরো না।

বেঙ্গমা - বেঙ্গমী আসছেন।

(বেঙ্গমীর হাত ধরে বেঙ্গমা। সঙ্গে একে একে পাশাপাশি ময়ূর আর পেরু, বক আর হাঁস, লক্কা পায়রা আর দাঁড় কাক, বাবুই ও তালচড়াই আসরে এলেন। খঞ্জন-খঞ্জনী এসে নাচ-গান আরম্ভ করলে।)

বেঙ্গমা - ভোজে আলো ঝলক দিয়ে আসে ঘুরে।

বেঙ্গমী - ভরা সাঁঝে ঝিলিক দিয়ে চলে দূরে।

সকলে - বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর-ঝুমুর আসা যাওয়া।''[১০]

রাসধারী ঃ

অবনীন্দ্রনাথের 'রাসধারী' নাটকটি ১৩২৭ বঙ্গাব্দে 'পার্বনী' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এই নাটকে রূপকথার চরিত্রের দেখা মেলে। দুয়োরাণী, দুয়োরাণীর ছেলে, সুয়োরাণী প্রভৃতি চরিত্রকে দেখতে পাওয়া যায়। রাসধারি তার ভালুক নিয়ে শহরের রাস্তায় চলেছে নাচ দেখাতে। সেই সময় দুয়োরাণীর নুলো ছেলে রাসধারীকে বলে ভালুকের নাচ দেখাতে। কিছু না দিলে সে তাকে ভালুকের নাচ দেখাবে না। আবার নুলোর কাছেও কিছুই নেই দেবার মতো। তাদের কথোপকথনটি তুলে ধরা যেতে পারে —

''নুলো — ও বাজিকর, একবার নাচাও না ভালুক।

রাসধারী — সন্দেশ খেতে দাও, তবে ভালুক নাচবে।

নুলো — আমরা গরীব, সন্দেশ তো ঘরে নেই।

রাসধারী — তবে পিঁপড়েও নেই তোমার ঘরে।

ভালুক — আচ্ছা চিঁড়ে-মুড়কি আনো, খেয়ে নাচব।

নুলো — তাও নেই।

রাসধারী — ঠাণ্ডা জল আছে তো তাই দাও।

নুলো — আমার হাত দুটি যে খোঁড়া। ঘরের মধ্যে এসো, দেখিয়ে দেব কোথায় জল।

ভালুক — তোমার মা ঘরে নেই?

নুলো — মা রাজার গোয়ালে ঘুঁটে কুড়োতে গেছে।

ভালুক — তোমার বাপ?

নুলো — বাবা আমার তো ফটিক রাজা।

রাসধারী — আহা, তুমি বুঝি রাজার দুয়োরাণীর ছেলে - তাই সুয়োরাণী তোমার হাত দুটি খোঁড়া করে দিয়েছে?

নুলো — না, বড়ো হয়ে পাছে আমি কাউকে রাজ্য দান করে ফেলি, সেই ভয়ে রাজার হুকুমে রাজবদ্যি জন্মাবামাত্র আমার হাতের শির কেটে দিয়েছে।''[১১]

আলোচ্য অংশে দুয়োরাণী, তার ছেলের দুঃখের কথাই চিত্রিত হয়েছে। যে রাজার স্ত্রী হয়েও ঘুঁটে কুড়িয়ে সংসার চালায়। অবনীন্দ্রনাথ নাটকে রূপকথার এই দুয়োরানী-সুয়োরানীর প্রসঙ্গটি ব্যবহার করেছেন।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ঃ

১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট নয় বছর 'রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদে আসীন থেকে শিল্প বিষয়ক যে ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেগুলিকে একত্রিত করে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। এই গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে শিল্পের আলোচনার অনুষঙ্গে তিনি রূপকথার প্রসঙ্গটি একাধিকবার উপস্থাপন করেছেন। এর দ্বারা তাঁর লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের দিকটিই ধরা পড়ে।

শিল্পের অধিকার ঃ

বহিরঙ্গের চর্চার দ্বারা না, শিল্পবোধ অন্তর থেকেই আসে একথাই তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন। অপর্যাপ্ত সম্পদ ও অবসর মিললেই শিল্প সৃষ্টি হয় না, এর একমাত্র উপায় 'রসপরতন্ত্রতা'। রসই সকল শিল্পের আত্মা। তবে আর্টিস্টিকে অন্যের অনুকরণ করলে চলবে না, তাঁর নিজের জন্য তাঁকে স্বতন্ত্র প্রকারের আয়োজন করতে হবে। তিনি বলেছেন —

''আর্টের একটা লক্ষণ আড়ম্বর শূন্যতা - সিমপ্লিসিটি। অনাবশ্যক রং-তুলির কলকারখানা, দেয়তি-কলম, বাজনা-বাদ্যি সে মোটেই সয় না। এক তুলি এক কাগজ একটু জল একটি কাজললতা

— এই আয়োজন করেই পূর্বের বড়ো-বড়ো চিত্রকর অমর হয়ে গেলেন। কবির এর চেয়ে কমে চলে গেল। কাগজ আর কলম, কিংবা তাও নয় — একতারা কী বাঁশি, অথবা তাও থাক, শুধু গলার সুর। সহজকে ধরার সহজ ফাঁদ, এই ফাঁদ নিয়েই সবাই তাঁরা চললেন - কেউ সোনার মৃগ, কেউ সোনার পদ্মের সন্ধানে। এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের যাত্রা - স্বপ্নপুরীর রাজকুমারীর দিকে; সাজ নেই সরঞ্জাম নেই সাথি সহচর কেউ নেই। একা গিয়ে দাঁড়ালেন অপরিমিত রস-সাগরের ধারে, মনের পাল সুবাতা - সে ভরে উঠল তো ঠিকানা পেয়ে গেলাম। রূপকথার সব রাজপুত্রের ইতিহাস চর্চা করে তো দেখবে - কেউ তাজি ঘোড়ায় চড়ে সন্ধানে বার হয় নি, এই যেমন - তেমন একটা ঘোড়া হলেই তারা খুশি। এও তো এক আশ্চর্য ব্যাপার শিল্পের — এই যেমন - তেমনের উপর সওয়ার হয়ে যেমনটি জগতে নেই, তাই গিয়ে আবিষ্কার করা! মাটির ঢেলা পাথেরের টুকরো সিঁদুর কাজল - এরাই হয়ে উঠল অসীম রস আর রহস্যের আধার।''[১২]

শিল্প ও ভাষা ঃ

একজনের মাতৃভাষা অপর এক বিভাষীর ক্ষেত্রে সহজে বোধগম্য হয় না, যদি না তার এ সম্পর্কে কোনো চর্চা না থাকে। কিন্তু তার কাছে কোনো ছবি মেলে ধরলে সে তা বুঝতে পারে। কেননা ছবির ভাষা অনেকটা সর্বজনীন ভাষা। তবে তার জন্য তাকে একটু চেষ্টা করতেই হয়। আর এ প্রসঙ্গে ই বলতে গিয়ে তিনি রপকথার কথা উল্লেখ করেছেন —

''কবির মাতৃভাষা যদি বাংলা হয় তবে বাংলা খুব ভালো করে না শিখলে ইংরেজ সেটি বোঝে না; তেমনি ছবির ভাষা অভিনয়ের ভাষা এসবেও দ্রষ্টার চোখ দোরাস্ত না হলে মুশকিল। মুখের কথা একটা না একটা রূপ ধরে আসে, কাগ্ বগ্ বললেই কালো সাদা দুটো পাখি সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির। শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে — রূপকথা, অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা-বলা নিয়ে চলন্তি ভাষা।''[১৩]

শিল্প ও দেহতত্ত্ব ঃ

এই প্রবেন্ধ তিনি ঐতিহাসিক, ডাক্তার ও সাহিত্যিকের কাজের মাপকাঠি নিয়ে কথা বলেছেন। ঐতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাক্তারের কারবার নিখুঁত হাড়-মাসের অ্যানটমি নিয়ে, আর আর্টিস্টদের কারবার অনির্বচনীয় অখণ্ড রসটি নিয়ে। তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে রসের প্রকাশ ঘটে। তাঁর হাতের স্পর্শে জড় ও প্রাণ প্রায়। এখানে তিনি সাহিত্যিকের কাজের ধরণের কথা বলতে গিয়ে রূপকথার সোনার কাঠি, রূপোর কাঠির প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন —

''ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়মূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামূলক। ঐতিহাসিককে রচনা করতে হয় না, তাই তার মাপকাঠি ঘটনাকে চুল চিরে ভাগ করে দেখিয়ে দেয়। ডাক্তারকেও জীবন্ত মানুষ রচনা করতে হয় না, কাজেই জীবন্মৃত ও মৃত মানুষের শবচ্ছেদ করার কাজের জন্য চলে তার মাপকাঠি, আর রচয়িতাকে অনেক সময় অবস্তুকে বস্তুজগতে, স্বপ্নকে জাগরণের মধ্যে টেনে আনতে হয়, রূপকে রসে, রসকে রূপে পরিণত করতে হয়, কাজেই তার হাতের মাপকাঠি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের, রূপকথার সোনার রূপোর কাঠির মতো অদ্ভুত শক্তিমান। ঘটনা যাকে কুড়িয়ে ও খুঁড়ে তুলতে হয়, ঠিক-ঠিক খোন্তা হল তার পক্ষে মহাস্ত্র, মানুষের ভৌতিক শরীরটার কারখানা নিয়ে যখন কারবার, ঠিক-ঠিক মাংসপেশী অস্থি পঞ্জর ইত্যাদির ব্যবচ্ছেদ করার শূল ও শলাকা ইত্যাদি হল তখন মৃত্যুবান, কিন্তু রচনা প্রকাশ হবার আগেই এমন একটি জায়গার সৃষ্টি হয়ে বসে যে যেখানে কোদাল কুড়ুল শূল শাল কিছু চলে না, রচয়িতার নিজে অস্থিপঞ্জর এবং ঘটাকাশের ঘটনা সমস্ত থেকে অনেক দূরে রচয়িতার সেই মনোজগৎ বা পটাকাশ, যেখানে ছবি ঘনিয়ে আসে মেরে মতো, রস ফেনিয়ে ওঠে, রং ছাপিয়ে পড়ে আপনা আপনি।''[১৪]

মত ও মন্ত্র ঃ

'মত ও মন্ত্র' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ চিত্র কলার আলোচনার প্রসঙ্গে রূপকথার কথা উল্লেখ করেছেন — ''মুখস্থ আউড়ে গেলে পাখি একটু না হয় ভুল করে, তার পাঠ বলে গেল ছেলে পরিষ্কার বইখানার পাতা খুলে দু-জনেই পুনরুক্তি করলে, অন্যের কথার প্রতিধ্বনি দিলে, বানিয়ে দুটো রূপকথা বললে না, ছড়া কাটলে না, কেননা কল্পনা নেই দু-জনেরই, কাজেই রচনা করলে না কেউ, সুতরাং আর্টিস্ট হবার দিকেও গেল না এরা, নকল নবিশ হয়েই রইল।''[১৫]

অসুন্দর ঃ

এই প্রবন্ধে লেখখ সুন্দর ও অসুন্দরকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। মিথ্যার আবরণে অসুন্দর নিজেকে আচ্ছাদিত করে আসে, অপর দিকে সুন্দর আসে অনাবৃত হয়ে। সত্যের উপর তার প্রতিষ্ঠা। আবার ব্যক্তি বিশেষের পার্থক্যে সুন্দর-অসুন্দরের ধারণাও পাল্টে যায়। এই আলোচনার সূত্র ধরেই এসেছে রূপকথার প্রসঙ্গ —

''বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে দুটি তিনটি কারিগর রয়েছে এক ওস্তাতের তাঁবেদার, তার সকালে আসে সন্ধ্যায় আসে দিনে আসে রাতে আসে — আলো-অন্ধকারের অধিবাসের ডালা নানা সাজসজ্জার উপকরণে ভরে নিয়ে। সৃষ্টির জিনিসকে নতুন-নতুন সুন্দর সাজে সাজিয়ে চলাই তাদের কাজ। কোনো দিন অবেলায় আফিস করে চুপি-চুপি ঢুকে দেখলে দেখা যায়, সেখানে এসেও এই কারিগর কয়জন

অতি অসুন্দর দোয়াত কলম খাতাপত্র টেবিল চেয়ার এমনকী বেহারার ঝাড়নটাকে পর্যন্ত চমৎকার আলো নয় তো চমৎকার ছায়া দিয়ে আশ্চর্য সৌন্দর্য দিয়ে গেছে — সেই আলো-অন্ধকারের রহস্য; তার মাঝে কালো যে হতভাগা বেরাল ছানাটিকে ঘর থেরে বার করে দিয়েছিলেম সে এসে ঘুমিয়ে আছে অপূর্ব সাজ ধরে রূপকথার বেরাল রাজকন্যাটির মতো।''[১৬]

জাতি ও শিল্প ঃ

এখানে লেখক জাতি ও শিল্পের সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছেন। এক জাতির থেকে অন্য জাতির শিল্প ও সাহিত্যের বহিরঙ্গ পার্থক্য দেখা গেলেও রসের দিক থেকে তাদের মধ্যে সাযুজ্য দেখা যায়। রসের দিক থেকে জগতের তাবৎ শিল্প এক। তবে জাতি আর্টের জননী হতে পারে না, আর্টিস্টই আর্টের জননী। জাতির কোলে তাদের বেড়ে ওঠা। তিনি বলছেন —

''জাতির কোলে শিল্পী এবং শিল্পও ধরা থাকে, দাস-দাসী জাতি কুটুম্বের মাঝে যেভাবে থাকে মা ও ছেলে। মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিলে, দাসীর কোলে সে ঘুমল, হয়ত মরল - তেমনি শিল্পীর অন্তরে শিল্প জন্ম নিলে, জাত দাসীর দলে সে নানা লীলা বিস্তার করলে, দাসীর দল আনন্দ পেয়ে বললে — ওগো জাতীয় শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে আমাদের ছেলেটির জাতের সঙ্গে জাতীয় শিল্প কবিতা ইত্যাদির যেটুকু যোগ তাও বাইরে-বাইরে ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে। জাত গেলে জাতির বিপদ গনে, কিন্তু শিল্প গেলে গান বন্ধ হলে কবিতা বন্ধ হলে চঞ্চল হয় জাতের মধ্যেকার দু-চার জনের মন। জাতীয় শিল্পের কত মন্দির ভাঙল, তার জন্যে চাঁদ তুললে কয়েকজন, জাতীয় কংগ্রেস বসল, তাঁতশালা বসল, পাঠশালা খুলল। চাঁদমামার ছড়া আউড়ে বার হল জাত পথে-পথে এক তালে এক সুরে এক প্রাণে, একটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুশি করে চাঁদা তুলতে। জাতীয় নাট্যমন্দিরে, কলাভবনে বা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা, তাতে করে আজকের ভারতবাসীর সঙ্গে কালকের ভারতবাসীর কলাবিদ্যার বাইরে-বাইরে কতকটা পরিচয় হল, যেন সেকালের রূপকথা শোনার কাজ হল, মনের কল্পনা উত্তেজিত হল খানিক, কিন্তু এতে করে আজকের আমরা আমাদের শিল্পকে নিজের করে যথার্থভাবে পেলাম না।''[১৭]

আবার তিনি অন্যত্র বলেছেন — ''মহাজাতি রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে মহাকাল দৈত্যের মতো তাকে ধরতে এসে কেল্লার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, কে জাগে? রাজকুমারী সাড়া শব্দ দেন না, সাড়া দেয় যে পাহারা দিচ্ছে মহাজাতির শিয়রে। কে জাগে? — সওয়াদগরের পুত্র জাগে। কাল নিরস্ত হয় আবার আসে দ্বিতীয় প্রহরে, কে জাগে? — মন্ত্রী পুত্র জাগে। তৃতীয় প্রহর যায়, কাল ফিরে এসে বলে, কে জাগে? — কোটালের পুত্র জাগে। রাত শেষে অন্ধকার পাতলা হয়, কাল ছুটে এসে বলে, কে জাগে? — রাজপুত্র জাগে।''[১৮]

আলোচ্য অংশেও তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে সওদাগর পুত্র, মন্ত্রী পুত্র, কোটাল পুত্র প্রভৃতি রূপকথার বিষয় নিয়ে এসেছেন।

রূপবিদ্যা ঃ

মানুষ রূপবিদ্যার চর্চা করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্যের চর্চা হয়েই চলেছে ক্রমান্বয়ে। কিন্তু তবু মানুষের এতে ক্লান্তি নেই, তারা এখান থেকেই তাদের রসাস্বাদন করে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। সময়ে সময়ে রূপদক্ষদের উপর আক্রমণ হয়েছে তবুও তাদেরকে রূপের চর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় নি। ভারতবাসী উত্তরাধিকার সূত্রে কাব্য সাহিত্য সংগীত নাট্য বাদ্য নৃত্য চিত্র মূর্তি সবই পেয়েছে। তবে এগুলির চর্চা ভারতবর্ষেই প্রথম শুরু হয়েছিল কিনা, অথবা অন্যদেশ থেকে এসেছে কিনা তার অনুসন্ধান সঠিকভাবে খুব একটা হয়নি। বিশেষ করে সংগীতের ক্ষেত্রে একথা বেশী করে প্রযোজ্য। কিন্তু ইউরোপীয়রা এই অনুসন্ধানের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

''মনে হয় শুনলে, এইভাবে সব জিনিসের চর্চা করে চলা শক্ত ব্যাপার। কিন্তু ইওরোপের মানুষ - তারা তো চলেছে এইভাবে, তারা তো মাটির তলা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের এক-একখানি পাতা এক-এক অধ্যায় উঠিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ করছে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার রূপের নানা পরিবর্তনের ইতিহাস — উপন্যাসের মতই যা মনোহর, রূপকথার মতোই যা অদ্ভুত।''[১৯]

স্মৃতি ও শক্তি ঃ

'স্মৃতি ও শক্তি'-র যথার্থ মিশেলেই সৃষ্টি হয় রচনা। তবে শুধু স্মরণশক্তির দ্বারাই ছবি বা কবিতা লেখা যায় না। তাতে এসে মিশতে হয় স্রষ্টার ভাবাবেগ, কল্পনা। তাই অভিধানে ধরা শব্দ দিয়ে কবিতা, নভেল, রূপকথা লেখা হলেও অভিধান কখনো রূপকথা বা কবিতা হয়ে ওঠে না। তিনি বলেছেন —

''অভিধানে ধরা কথা — তাই নিয়েই তো কবিতা নভেল রূপকথা সবই লেখা হয়, কিন্তু তাই বলে অভিধানকে রূপকথাও বলা চলে না, কবিতা নভেল কিছুই বলা চলে না। ব্যাকরণ ধরে কর্তাকর্ম ইত্যাদি নিয়মে কথা সাজিয়ে গেলে কিংবা ঘটনা পরম্পরার অন্তর্গত করে সব কথা বলেও দেখি সেটা খবরের কাগজের প্রবন্ধ হয়, সাহিত্য হয় না। উত্তমাধম ভাবে একদল লোক বসিয়ে তার ফটো - সে তো একটা নিপুণভাবে লেখা চিত্রের লোক সন্নিবেশের সমান হয়ে উঠতে পারে না।''২০

আর্য ও অনার্য শিল্প ঃ

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক প্রথমে আর্য ও অনার্যদের সম্পর্ক নিয়ে আলেচানা করেছেন। প্রাচীন

ঋষিরা যাঁদের অন্যব্রত, অকর্মা বলে অভিহিত করত। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতীয় শিল্পকলার চর্চায় এই অনার্য তথা অন্যব্রতদেরও ভূমিকা আছে। তিনি আবার এই আর্য ও অন্যব্রতকে দুটো জাতি না বলে একই জাতির দুটো থাক বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয় এই আর্যদের চিন্তা, কল্পনা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে অনার্যদের প্রভাব পড়েছিল তারও জানান দিচ্ছেন এইখানে —

''ভারতবর্ষের আর্য ঋষিগণের চিন্তা কল্পনা ক্রিয়া কর্ম সবেতেই তাঁদের পূর্বতন আর্যদের অবস্থার ছাপ কী সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান তা দেখছি — সুতরাং ভারত শিল্পের ইতিহাস শুধু বৈদিক যুগ পর্যন্ত নয়, তারও এবং আরও পূর্ব থেকে তার ধারা চলে আসছে — এইটেই বলতে হল। আত্মা এবং পরমাত্মা দুই কেমন যেমনি দেখতে হল অমনি ঋষিরা তাঁদের সেই পূর্বতন অবস্থার দুটি পাখির উপাখ্যান দিয়ে ছবি দিলেন 'দ্বা সুপর্ণা' — একটি পাখি জেগে থাকে একটি পাখি ঘুমিয়ে থাকে। কোনো অখ্যাত যুগের রূপকথার পাখি যখন আর্যদের পূর্বপুরুষরা সবেমাত্র কথা বলতে আওন পোহাতে শিখেছেন তারা স্মৃতি ছন্দের দ্বারা নিরূপিত হল, ঋষিদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান তাকে তলিয়ে দিতে পারলে না। তারপর থেকে পাথরে ধাতুতে কবিতায় গানে রূপকথায় আর্য সভ্যতা কতবার কত ভাবে এই দুটি পাখি বেঙ্গমা-বেঙ্গমী এবং শুক-সারীর আকারে ধরে গেল তার ঠিক নেই —

'সাই সুয়া দুড পাখী গাহিন নদী চরে
ম্যাও গহিন শুকায়া গেলে শুন্যি উড়াল ছাড়ে
ধবল বরন কবুতার চিরল বরণ আখি'

— এমনি সব কথা এ আর্য অনার্য দুয়ের আত্মীয়তার কথা, না জানিয়ে থাকতে পারছে না। কাজেই বলতে হয় আর্য শিল্পের ভিত্তি অনার্য যুগের উপরে।''[২১]

এই আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি রূপকথা, ব্যঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, শুক-সারীর কথা নিয়ে এলেন। লোকসাহিত্য তথা লোকশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ এই প্রবন্ধাবলীর অনেকাংশেই ধরা পড়েছে।

রূপ ঃ

'রূপ' নিয়েই আর্টিস্টের কারবার। এইজন্যই আর্টিস্টের আর এক নাম 'রূপদক্ষ'। উপযুক্ত রূপ অনুপযুক্ত রূপ এমন কথা আর্টের ক্ষেত্রে চললেও, সুরূপ কুরূপ বলে স্বতন্ত্র দুটো রূপ আর্টিস্টের কাছে নেই। তার কাছে নানা রূপ নানা কাজের উপযোগী হয়ে ধরা দেয়। আর এই প্রসঙ্গেই এসেছে রূপকথার রাজকন্যার কথা —

''যে রূপ সমস্ত নিয়ে রূপকারের কারবার তারা বাঁধা রূপ, আর্টিস্ট তাদের মুক্তি দিলে তবেই তারা পথ পেলে মন থেকে মনে চলাচলি করবার। রূপসাগরের তলায় সুপ্তি দিয়ে বন্ধ করা রূপকথার

রাজকন্যা, রূপমুক্তির সাধনা হল তাকে জাগিয়ে আনা। রেখা মুক্তি পেলে তো রং ধরে বাঁধা রূপের প্রাচীর টপকে সে ভাব রাজত্বে পালাল বন্দী।''[২২]

ভাব ঃ

আর্টিস্ট স্বভাবতই ভাবুক হয়। তার ভাবুকতা সাধারণের ভাবুকতা থেকে ভিন্ন। যে ভাবুক সে নিজে ভালোবাসে সাজ, অপরকে ভালোবাসে সাজাতে। এই রস ও ভাবের উদয় হলেই কবিতা, ছবি, গান বেরিয়ে আসে। আর আর্টিস্ট নানা উপায়ে ভাবযোজনা করে থাকে রূপ রচনাতে। তাই রূপ আর বস্তুর মূল্য তার ভাবসম্পদের দ্বার নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এসেছে রূপকথার রাজকন্যের কথা —

''রূপকথায় শুনেছি - পাতার ঠোঙায় কোনো এক রাজকন্যার একগাছি চিকন কেশ তাই দেখে বিভোর হল ভাবে রাজপুত্র। এই রূপকথা সুতরাং কথার কথা বলতেও পারে, কিন্তু আকাশের প্রান্তে কাজল মেঘের সুর একটা তুলির টান দেখে রস পায়। সাদা কাগজে একটি টান, অন্ধকারে একটি আলোর রেখা — এসব ভাব জাগায় কিনা পরীক্ষা করে দেখলেই পার।''[২৩]

কারুছত্র ঃ

এই প্রবন্ধে লেখক কাব্যকলা, শিল্পকলা, নাট্য, নৃত্য প্রভৃতিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার কথা বলেছেন। এরই পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পেরও যত্ন নেওয়ার অভিমত প্রকাশ করেছেন। কোনো কিছুকেই ছোটো বলে অবহেলা করা উচিত নয়। আকাশ বিশাল ছাতের মতো হলেও যখন সেখান থেকে বৃষ্টি নামে তখন ক্ষুদ্র ছাতাতেই অনেক কাজ দেয়। এই প্রসঙ্গেই বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

''ছত্র, গোষ্ঠী এসব যত ছোটো হয় ততই জমে ভালো, কাজেও আসে বেশি। সূচ খুব ছোটো কিন্তু অত্যন্ত কাজের। দৈত্যপুরীর কাঁকুড় খুব বড়ো কিন্তু রূপকথাতেই তার কাজ শেষ। জিনিসটা কাজের হলো কি হলো না এই নিয়ে কথা; ছোটো হলো কি বড়ো হলো সে নিয়ে কথা নয়।''[২৪]

আর এখানেই আলোচনার সূত্র ধরে এসেছে রূপকথার দৈত্যপুরীর কাঁকুড় এর কথা।

রূপ-রেখার রূপকথা ঃ

আলোচ্য প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বুকে রং ও রেখার লেখার কথা শুনিয়েছেন। বিশ্ব প্রকৃতিতে চারিদিকে রঙের খেলা। রেখা ঠাঁই পায় না, রং এর প্রকাশে সংসার ভরে যায়। উদাসী মানুষের বুকে রেখার জন্যে বিশ্বের বেদনা জাগলেও শেষমেস সে রং কাছেই নিজেকে ধরা দেয়। আর সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি নিয়ে এসেছেন রূপকথার রাজপুত্রে কথা —

''উদাসী মানুষের রূপবান ছেলে সে ঘরের কোণে বড়ো হয়েই শুনতে পায় রেখার কান্না, চলে যায় সে রূপকথার রাজপুত্র রং-এর যুগে বন্দিনী - ঘুমন্ত রেখাকে জাগিয়ে তুলে ঘরে আনতে — সে কত দিন যায়, কত কাল যায়, রং হাসে দিকে-দিকে রক্ত আলোর অট্টহাস। রেখার প্রেমে পাগল নীল আকাশের চাঁদের রেখাকে ধরার ফাঁদ হাতে নিয়ে ছেলে পথে ফেরে, বাঁশি বাজায়, গান গায়, ছবি লেখে, কথা গাঁথে, ঘুরে ঘুরে নাচে। যেতে যেতে রং এর পাগলীর সঙ্গে দেখা হয় একদিন রেখার জন্য পাগল রূপবান ছেলের, দুজনকে দুজনের মনে ধরে যায়, এ দেয় ওকে হোলিখেলার পিচকারি, ওদেয় তাকে চোখের পাতার কাজল-পাতা, দুজনে মিলে খেলাঘর পেতে বসে যায় রূপকথার রাজত্বে গিয়ে।''[২৫]

এইভাবে দেখা যায় অবনীন্দ্রনাথ কোথাও রূপকথার আদলে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, কোথাও গল্পের মাঝে নিয়ে এসেছেন রূপকথার প্রসঙ্গ। আবার কখনো কখনো প্রবন্ধের মাঝে আলোচনার অনুষঙ্গে ব্যবহার করেছেন রূপকথার বিষয়।

—০—

তথ্যসূত্র

১) শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১১।

২) তদেব, পৃঃ ১৩।

৩) তদেব, পৃঃ ২৪।

৪) ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৭।

৫) তদেব, পৃঃ ৪৭।

৬) আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ পৃঃ ৩৪-৩৫।

৭) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ২৪৯।

৮) তদেব, পৃঃ ২৫৩।

৯) মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১২৭।

১০) রং বেরং, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩০৭।

১১) রাসধারী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩৪৮।

১২) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী / শিল্পের অধিকার, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ১৩।

১৩) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, শিল্প ও ভাষা, তদেব, পৃঃ ৪২।

১৪) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, শিল্প ও দেহতত্ত্ব, তদেব, পৃঃ ৭৮-৭৯।

১৫) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, মত ও মন্ত্র, তদেব, পৃঃ ৯৯।

১৬) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অসুন্দর, তদেব, পৃঃ ১৭৯।

১৭) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, জাতি ও শিল্প, তদেব, পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

১৮) তদেব, পৃঃ ১৯৪-১৯৫।

১৯) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, রূপবিদ্যা, তদেব, পৃঃ ২১৯।

২০) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, স্মৃতি ও শক্তি, তদেব, পৃঃ ২৪২।

২১) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, আর্য ও অনার্য শিল্প, তদেব, পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

২২) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, রূপ, তদেব, পৃঃ ২৬৫।

২৩) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ভাব, তদেব, পৃঃ ২৯৩।

২৪) কারুছত্র, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৩৮০।

২৫) রূপ-রেখার রূপকথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৪২৫।

—০—

ব্রতকথা

লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম উপাদান ব্রতকথা। গ্রামবাংলার মানুষ বিশ্বাস করে এই ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করে ইপ্সিত ফল লাভ করা যায়। সাধারণত সধবা বা কুমারী নারীরা ব্রত করে থাকেন। এই ব্রত পালনের মূলে থাকে তাদের কামনা-বাসনার চরিতার্থতা। তারা এর মধ্য দিয়ে স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনা করে, পারিবারিক সুখ-শান্তি ও ভাবী জীবনের সুখ-শান্তি কামনা করে থাকে। এখানে যারা পূজিত হলেন তাঁরা পৌরাণিক দেবদেবী নন, মূলতঃ লৌকিক দেবদেবী। কুমারী ব্রতে শাস্ত্রীয় ব্রতের মতো এত মন্ত্রতন্ত্র ও শাস্ত্রীয় বিধির কাড়াকাড়ি নেই, এখানে কুমারী হৃদয়ের কামনা-বাসনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রতের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন কাহিনীর প্রয়োজনে। আবার ব্রতকথা নিয়ে তিনি 'বাংলার ব্রত' নাম এ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে যার মূল্য অপরিসীম।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'শকুন্তলা' রচনায় দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার গল্প বর্ণনা করেছেন। দুষ্মন্ত মাধব্যের সাথে মৃগয়ায় বেরিয়ে এবনে সেবনে শিকার করে বেড়ালেন। তারপরেই তার সাথে দেখা হয়ে যায় তপোবনের দুহিতা শকুন্তলার। রাজা আর দেশে ফেরার নাম করেন না। মাধব্য তাকে কত বোঝান তবু রাজার হেলদোল নেই। এদিকে —

''রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করেছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্য সামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।''[১]

কামনা-বাসনা পূরণের আকাঙ্ক্ষায় নারীগণ ব্রত পালন করে। দুষ্মন্তের মাতাও পুত্র তথা রাজ্যের কল্যাণের জন্য ব্রত পালন করেছেন।

'বুড়ো আংলা' গল্পের রিদয় খুব দুষ্টু ছেলে। সর্বদাই সকলকে জ্বালাতন করে চলে। একবার গণেশ ঠাকুরকে যেই কুঁড়োজাল দিয়ে চাপা দিয়েছে অমনি গণেশ ঠাকুরের অভিশাপে রিদয় মানুষ থেকে বুড়ো আঙুলের মতো যকে পরিণত হয়ে গেছে। তারপর চলে গণেশ ঠাকুরের খোঁজে রিদয়ের পথ চলা। পথে গুগলির সাথে দেখা হল। সে চলেছে গঙ্গার স্নানে। কিন্তু রিদয় যেতে চায় কৈলাশ এ। যেখানে গণেশের সাথে দেখা করে মাপ চেয়ে আবার সে মানুষে পরিণত হতে চায়। কিন্তু গুগলী তার সঙ্গী হতে চাই না। আর তখনই দেখা যায় —

''ঠিক সেই সময় খোঁড়া-হাঁস পুকুর থেকে ছপছপ করে উঠে এসে টুপ করে গুগলীটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল। রিদয় তাকে শুধোলে — 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'মানস-সরোবর!' বলে হাঁস হেলতে দুলতে আগুয়ান হল।' রিদয় দেখলে বড়ো সুবিধে, মানস-সরোবর পর্যন্ত হাঁসের সঙ্গে যাওয়া যাবে; তারপর তিব্বত, তারপরেই কৈলাস। সে আর কোনো কথা না বলে তার মা সুবচনী ব্রত করতে যে খোঁড়া হাঁস পুষেছিলেন, তারি সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।''[২]

সুবচনী ব্রত সারা বছরই করা যায়। এই ব্রত করতে চার জোড়া হাঁস এবং একটা খোঁড়া হাঁস এর দরকার হয়। এর সাথে আরো অন্যান্য উপকরণ লাগে। যেমন - ঘট, আমসরা, পান, সুপুরি, পদ্মফুল, নাড়ু, তিল, সিঁদুর, ও আলপনার জন্য পিটুলি প্রভৃতি। এই ব্রত পালন করলে সৌভাগ্য ও সন্তান লাভ হয় এবং সুখে-শান্তিতে জীবন কাটে বলে মানুষ বিশ্বাস করে।

'উড়নচণ্ডীর পালা' তে বিরুমল্ল নামে এক শিকারি পম্পা সরোবরে জাল ফেলাবে শুনে কূর্ম ভয় পেয়ে পতিত পবনকে ডাকতে শুরু করে। তারপর আকাশে উড়তে গেলে সেখান থেকে মাটিতে পড়েও বেঁচে যায়। আর এটা সম্ভব হয়েছে উড়নচণ্ডীর ব্রত করার জন্য। সে বলে —

''কূর্ম! বাঙলাদেশের নরম মাটি বলেই এবারে আকাশ থেকে পড়ে রক্ষে পেয়ে গেলাম — ধন্যবাদ হে পতিত পাবন উড়নচণ্ডীর ব্রত, ভালোয় ভালোয় সাঙ্গ হলো তোমার কৃপায়। চলি গঙ্গা স্নানে।''[৩]

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র 'সাদৃশ্য' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও শিল্পে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে সাদৃশ্য তুলনা করা হয় তার কথা বলেছেন। কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে কালে কালে অনেক উপমাই যাচাই হয়ে স্থান পেয়েছে। পৃথিবীকে বোঝাতে 'গোমাতা' এই প্রাচীন সাদৃশ্য ব্যবহার করা হত, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে এর ব্যবহার চলল না। অবনীন্দ্রনাথের কথায় —

''বসুন্ধরা ব্রত করেছে গাঁয়ের মেয়েরা। সেখানেও বসুমাতাকে গোমাতা সদৃশ্য করে আলপনা দিলে না, একটি পদ্মপাতায় একটি মাত্র জল বুদবুদ এরই সাদৃশ্য দিলে ব্রতচারিণী কুমারী শিল্পী।''[৪]

বৃষ্টির কামনা করে মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। বৃষ্টির জলে ধরিত্রী সিক্ত হয়ে পৃথিবী আবার শষ্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে, তারা এই প্রার্থনায় ব্রতটি করে থাকে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিল্পায়ন' প্রবন্ধের এক স্থানে শিল্পের রকমফের এর কথা বলেছেন। একই শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-কৌশলে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প সৃষ্টি করে চলেন। এরপরই তিনি আসছেন ধর্মশাস্ত্রের

প্রসঙ্গে। দেখা যায় সব জাতেরই ধর্মশাস্ত্র রয়েছে এবং মানুষ নানা পদ্ধতিতে নিজ নিজ ধর্মপালন করে চলে। কিন্তু এর ফলে সে পরলোকে কী ফল পেল তা জানার উপায় থাকে না। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে ফল হাতে নাতে পাওয়া যায়। ছবি, গান প্রভৃতি দেখে শুনে আমরা তার ভালো-মন্দ বিচার করতে পারি। আবার মেঘমল্লার গাইলে বৃষ্টি নামে, দীপক রাগ গেয়ে আগুন জ্বালানো যায়, এমন সব লোক প্রসিদ্ধি প্রচলিত আছে, কিন্তু এর সত্যাসত্য প্রমাণ করা কঠিন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ব্রতক্রিয়ার কথাও নিয়ে এসেছেন —

''এখনও মেয়েরা নানা ব্রতক্রিয়া করে চলেছে বৃষ্টির আশায়, ফসলের আশায়, স্বামীর ঘরে আদর পাওয়ার এবং সপত্নীর মাথা খাওয়া ও মাছে-ভাতে থাকবার আশায়। পুরুষেরা চলল নানা যাগযজ্ঞ ক্রিয়া করে বৈদিক যুগ থেকে। ইন্দ্রকে খুশি করে জল আদায় হল না সে ক্রিয়ায়, ধুম হল যথেষ্ঠ কিন্তু আগুনে কাঠ পোড়ানোতে ঘি জ্বালানোতে। পাথরে চন্দনকাঠ ঘর্ষণের প্রক্রিয়ার দ্বারায় চন্দন-পঙ্ক লাভ করা গেল, বারুদে আগুন ছোঁয়ানোর ক্রিয়াতে প্রচণ্ড শব্দে একটা ভীষণ কাণ্ডের অবতারণা হল, প্রক্রিয়ার পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাওয়া গেল। নীলে মেলালাম হলুদ, লালে মেলালাম নীল, পাওয়া গেল সুবজ বেগুনি।''[৫]

এইভাবেই মানুষ বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে নানা ক্রিয়াকর্ম করে চলে যুগের পর যুগ ধরে। মেয়েরাও ব্রত পালন করে চলে তাদের পারিবারিক কল্যাণের আশায়।

অবনীন্দ্রনাথ এর 'বাংলার ব্রত' এক গবেষণাধর্মী রচনা। 'ব্রত' নিয়ে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা পরবর্তীকালে আর তেমন চোখে পড়ে না। পরবর্তী কালে 'ব্রত' নিয়ে আলোচনা করতে যেই গিয়েছেন তাঁকে এই গ্রন্থটির সাহায্য কোনো না কোনো ভাবে নিতে হয়েছে। মূলতঃ ঐহিক কমনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ব্রত পালন করা হয়। অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন —

''কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।''[৬] তিনি ব্রতকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছেন — শাস্ত্রীয় ব্রত ও মেয়েলি ব্রত। আবার মেয়েলি ব্রতকে কুমারী ব্রত ও নারী ব্রত — এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। খাঁটি লৌকিক ব্রত বলতে তিনি মূলত কুমারী ব্রতগুলিকেই বুঝিয়েছেন। শাস্ত্রীয় ও নারী ব্রতে যেখানে ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রীয় বিধি বিধানের কড়া অনুশাসন, সেখানে কুমারী ব্রতে পুরোহিত ও তন্ত্রমন্ত্রের কোনো স্থান নেই। কুমারী মেয়েরাই এখানে সকল ভূমিকা পালন করে। কামনা অনুযায়ী আলপনা আঁকা, তার উপর ফল ধরে ছড়া কাটা ও শেষে ব্রতকথা থাকলে তা শ্রবণ করা — এসবেই তারা নিজেরা অংশ গ্রহণ করে থাকে।

ব্রতে মূলতঃ থাকে ব্রতিনীদের কামনার ছাপ। তবে শুধু সে একবার কল্যাণ কামনা করে না, সকলের কল্যাণ কমানা করে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন — ''একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া ব্রত অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া, কিন্তু ব্রত তখন, যখন দশে মিলে এক কাজ এক উদ্দেশ্যে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হলো — একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে।''[৭]

আর এখানেই শাস্ত্রীয় পূজার্চনার সাথে ব্রতের পার্থক্য। শাস্ত্রীয় পূজার্চনাতে যেখানে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায়, ব্রতে সেখানে সকলের কল্যাণ কামনা করা হয়। আর এই স্বামী-সংসার-সন্তান-পরিজন সকলের কল্যাণ সাধনায় জন্ম নিয়েছে একাধিক ব্রত। পূর্ণিপুকুর, দশপুত্তল, ভাদুলি, মাঘমণ্ডল, অশ্বত্থপাতা আদর সিংহাসন প্রভৃতি। এই ব্রতের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন —

''ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষের বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত। পুরানের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।''[৮]

এরই পাশাপাশি তিনি ব্রতগুলির উৎপত্তির পেছনে কতকটা মানুষের শিল্প চেতনাও রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে নারীরা যেন নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রেরই জয় ঘোষণা করেছে।

ব্রতে ছড়া মন্ত্রের ভূমিকা নেয় আর আলপনার মধ্য দিয়ে তারা তাদের কামনাকে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর কথায় — ''প্রথমে কামনা মনে উঠল, তার পর সেটা আলপনায় অথবা পিটুলি দিয়ে চিত্রিত গঠিত এবং সজ্জিত হলো, শেষে ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হলো। আগে কামনা, তারপর আলপনা, তারপর ছড়া, শেষে ব্রতের কথা বা ইতিহাস — এই কটা মিলে ব্রত পূর্ণতা পেল।''[৯]

ব্রতের ছড়ার মধ্যে তিনি নাট্যলক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি 'ভাদুলি' ব্রতের অনুষ্ঠানকে চারটি দৃশ্যে ভাগ করে ছড়ার নাট্যগুণ দেখিয়েছেন। আবার এই ব্রতের মধ্যে নানা সামাজিক চিত্রেরও ছবি পাওয়া যায়। তখনকার সময়ে নৌকা লোকযান হিসাবে বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হত। তার কথা আমরা ভাদুলি ব্রতে পাই —

''একুল ওকুল উজান ভাটি,
নামলাম এসে আপন মাটি।

এক নৌকা চড়ায় লাগালাম,

এক নৌকা ছাড়লাম।''[১০]

আগেকার সমাজে এক নারী বহু সতীন নিয়ে ঘর করতে হত। যা ছিল খুব যন্ত্রণার। তাই একে অপরের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত লেগে থাকত। সেকথা আমরা 'সেঁজুতি' ব্রতের ছড়ায় দেখতে পাই —

''ময়না, ময়না, ময়না!

সতীন যেন হয় না।

হাতা, হাতা, হাতা!

খা সতীনের মাথা।

বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি!

সতিন মাগি টেরি।

পাখি, পাখি, পাখি!

সতি মাগি মরতে যাচ্ছে

ছাদে উঠে দেখি।''[১১]

ব্রতের ছড়ার সাথে সাথে তিনি ব্রতের আলপনাগুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন। বাংলার আপলনার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মাদ্রাজ বা বোম্বায়ে তিনি এত সুন্দর লতামণ্ডল দেখেন নি। তিনি বলেছেন —

''আলপনা যে কত রকমের তার হিসাব নিলে দেখা যায়, এখনকার আর্ট স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে ঢের বেশি জিনিস মেয়েরা না-শিখেই লিখেছে এবং সৃষ্টিও করছে। শ্রেণী বিভাগ করলে আলপনার ফর্দটা এই রকম দাঁড়ায়। প্রথম পদ্মগুলি, দ্বিতীয় নাগ লতামণ্ডল বা পাড়। তৃতীয় গাছ, ফুল, লতা ইত্যাদি। চতুর্থ নদ-নদী ও পল্লী জীবনের দৃশ্য। পঞ্চম পশু-পক্ষী, মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ চন্দ্রাসূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র। সপ্তম আভরণ ও নানা প্রকার আসবাব। অষ্ঠম পিঁড়িচিত্র।''[১২]

তবে এই আপলনার যেমন একটা নান্দনিক দিক আছে, আর একটি দিক আছে এর যাদুর দিক। লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা হয় গৃহের অভিমুখে। এর একটাই কারণ থাকে লক্ষ্মী ঐ পথ দিয়ে গিয়ে গৃহে আশ্রয় নিলে আর গৃহবর্হিমুখী হবেন না। এ একপ্রকার যাদু বিশ্বাস। এইভাবে অনীন্দ্রনাথ তাঁর এই গ্রন্থে ব্রত এর আলোচনার সাথে সাথে তৎকালীন সমাজ-ইতিহাস, ছড়া ও আলপনা নিয়েও তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন।

—০—

তথ্যসূত্র

১) শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৫।

২) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৪৮।

৩) উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৩৯।

৪) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, সাদৃশ্য, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ৩০৬।

৫) শিল্পায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ৩৬৫।

৬) বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১৩।

৭) তদেব, পৃঃ ১৯।

৮) তদেব, পৃঃ ১৮।

৯) তদেব, পৃঃ ৭০।

১০) তদেব, পৃঃ ৪৩।

১১) তদেব, পৃঃ ৪৫।

১২) তদেব, পৃঃ ৬৭।

—০—

লোকসঙ্গীত

লোকসঙ্গীত লোকোসাধারণের প্রাণের জিনিস। কথার যেখানে শেষ, সঙ্গীতের সেখানে শুরু। সঙ্গীত মানুষের শ্রমযন্ত্রণাকে কমিয়ে দেয়। অঞ্চল বিশেষে নানা লোকসঙ্গীত প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। যেগুলি মানুষের জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রায়শই চোখে পড়ে। তবে সেগুলির সবই লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না। কিছু কিছু অবনীন্দ্রনাথের নিজ সৃষ্টি। আমরা নিম্নে তাঁর রচনায় লোকসঙ্গীতের ব্যবহার তুলে ধরব।

ভুতপত্রীর দেশ ঃ

এই গল্পের কথক মাসির বাড়িতে মোয়া খেয়ে পালকিতে চড়ে চলেছে পিসির বাড়ি। তারপর রাস্তাতে তার পালকি ভুতেদের কবলে পড়ে। তারাই তার পালকি বয়ে নিয়ে চলে। আর তাদের মুখ থেকে পালকির যে গানটা তিনি শুনতে পাচ্ছেন তা যেন 'কুহুকেকা'র পালকির গান। কিন্তু সুর ও কথাগুলো সব উল্টোপাল্টা হয়ে তার কানে এসেছে। সবটাই যেন তার কাছে ভুতুড়ে মনে হয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি শুনছেন সেই গান —

''চলে চলে
হুমকিতালে
পংখী গালে
মাসিপিসি
বাঘবেরালে।

ভুতপেরেতে
চলেছে রেতে
হনহনিয়ে
ভুত পেরেতে।

পাল্‌কি দোলে
উঠতি আলে
নাল্‌কি দোলে
নামতি খালে

আলো-আঁধারে
শেওড়া গাছ
কালোয় সাদায়
বেরাল নাচ।

মরানদী
বালির ঘাট
মনসাতলায়
মাছের হাট।

ভূতের জমি
ভুতের জমি
ভুতপেরেতের
নাইকো কমি।

উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে
চলছে কতক
হনহনিয়ে
হঁনহঁনিয়ে।

চলছে কতক
গাছতলাতে
দুলছে কতক
তালপাতাতে।

দিন দুপরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাত দুপুরে
হুতুম ঘুমোয়।

ভোঁদর ভাম
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি

টিকটিকি আর
কানামাছি।

গঙ্গাফড়িং
সোনাকপোকা
আরসোল্লা
ন্যাংটা খোকা।

ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাঁকশেয়াল
শুকনো পাতা
গাছের ডাল!

সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
ঘুরনি-হাওয়ায়
চলছে ঘুরে।

জগৎ জুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুলছে কুলো।

সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
আলো-আলোয়
জ্বলছে দূরে।

সব ভুতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুর তলায়
ইঁটের ঢেলা ...''[১]

পালকির গান শ্রমসঙ্গীতের মধ্যে পড়ে। যা লোকসঙ্গীতের একটি বিভাগ। বেয়ারারা তাদের শ্রম লাঘব ও একসাথে পা ফেলানোর তাগিদে সুর করে গান করত। তবে আলোচ্য অংশে অবনীন্দ্রনাথ হাস্যরস সৃষ্টি করতে এই অংশের অবতারণা করেছেন।

নালক ঃ

দেবল ঋষির তপোবনে ধ্যানে বসে ছোট্ট নালক চোখের সামনে দেখে চলেছে বুদ্ধদেবকে নিয়ে একের পর এক ছবি। বুদ্ধদেবের জন্ম, ছেলে যাতে সন্ন্যাসী হয়ে চলে না যায় তার জন্য পিতা শুদ্ধোদনের উৎকণ্ঠা প্রভৃতি। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন আর ঘরে টিকেনা। তাঁর মনোরথ ভেসে চলে জগৎ সংসারের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে —

''... আকাশের উপরে ঠাণ্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলো-ছায়া, তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস — ফুর-ফুরে দখিন বাতাস — জলে-স্থলে, বনে-উপবনে, ঘরে-বাহিরে, সুখের পরশ দিয়ে, আনন্দের বাঁশি বাজিয়ে। সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠেছে, মনের পাল ভরে উঠেছে। মনোরথ আজ ভেসে চলেছে, নেচে চলেছে — সারি গানের তালে-তালে সুখ সাগরের স্থির জলে। স্বপ্নের ফুলের মতো শুকতারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে — পৃথিবীর দিকে।''২

'সারি-গান' বাংলার একটি জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। নৌকা বাইচের সময় সারিবদ্ধভাবে বৈঠার তালে তাল মিলিয়ে মাঝিরা এই গান গেয়ে থাকে। সারিবদ্ধ ভাবে একসঙ্গে বসে এই গান গাওয়া হয় বলে এটি সারি-গান নামে পরিচিত। এতে করে শ্রমের কিছুটা লাঘব হয়।

আলোর ফুলকি ঃ

চিনে মুরগি একটি মজলিসের আয়োজন করেছে। যেখানে একে একে মুরগি, পাখি, পতঙ্গ সবাই যোগ দিচ্ছে। এই মজলিসের মূল উদ্দেশ্য হায়দ্রাবাদী মোরগ দিয়ে কুঁকড়োকে মেরে ফেলা। কেননা কুঁকড়ো গান গেয়ে রাত্রির অন্ধকার দূর করে পাহাড়তলিতে আলো ফুটিয়ে দেয়। মজলিসের বোলতা, ভোমরা, মৌমাছি গঙ্গ-ফড়িং সবাই গান গেয়ে চলেছে। আর এখানে এসেছে কীর্তন, বাউল গানের প্রসঙ্গ —

''শুধু যে বোলতারাই গাইছিল তা নয়; ভোমরা, মৌমাছি, গঙ্গা-ফড়িং সবাই দলে দলে বাদ্যি আর গান জুড়ে দিলে। চিনি দিদি গড়ের মাঠের বাদ্যির যত দল, তাছাড়া কালোয়াতি কীর্তন বাউল সবরকম জোগাড়ই করেছিলেন। কেবল চুনোগলির ব্যাঙটা তিনি জোগাড় করতে পারেন নি।''৩

বহিত্র ঃ

রবাণ ও কালনেমি বহিত্রে চেপে চলেছে কৈলাসে কুম্ভকর্ণের ছেলেদের জন ময়ূর আনতে।

আর রাবণের মামা কালনেমি বহিত্রে মাঝির জায়গায় বসে ভাটিয়ালি গান শুর করেছে —

''বাবা, বহে চল বহিত্র
কুড়ি হাতে
দেখ ফুটা না হয় কলস কটাতে
মাঝ-দরিয়াতে অত্র!''[৪]

ভাটির টানে নৌকো ভাসিয়ে বৈঠা ধরে মাঝিরা এই গান গেয়ে চলে। ভাটিয়ালি একক সঙ্গীত।

পথে-বিপথে / টুপি ঃ

'পথে-বিপথে' অবনীন্দ্রনাথের একটি ভ্রমণমূলক রচনা। এই রচনায় 'টুপি' নামক অংশে জাহাজের খালাসিদের সারি গানের সুরে আসর জমিয়ে তোলার কথা উল্লেখ করেছেন —

''উত্তর থেকে অ্যালো বঁধু ভাঙা লয়ের গুণ টানা,
আমার বঁধু দাঁড়িয়ে আছে পুন্নিমের ওই চাঁদখানা!
বঁধুমুখের হাসি দ্যাখলে নয়ানজলে ভাসি,
বঁধুর কথা রসে-ভরা ঠিক যেন চিনির পানা।''[৫]

এই গানটির মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথ সারি গানের সুর খুঁজে পেয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা জুড়ে গানের ব্যবহার প্রায়শই চোখে পড়ে। তবে সেগুলির সবই লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি যেমন লোকসঙ্গীতের ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও কোথাও নিজ সৃষ্ট গানেরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

—০—

তথ্যসূত্র

১) ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১১৭।

২) নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৪৩।

৩) আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৮।

৪) বহিত্র, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৩১।

৫) পথে-বিপথে, টুপি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ৩৫।

—০—

প্রবাদ

প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি প্রচীনতম শাখা। এর মধ্যে মানুষের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা সঙ্গবদ্ধরূপ লাভ করে। লেখকদের মধ্যে রচনায় প্রবাদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে। কেননা এর মধ্য দিয়ে অল্পকথায় অনেক কথা বলা হয়ে যায়। শুধু তাই নয় প্রবাদের ব্যবহারে ভাষা সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে এবং ভাষার মধ্যেকার প্রাণশক্তি বেড়ে যায়। তাই দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন লেখকদের রচনায় এর ব্যবহার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চর্যাপদ, মধ্যযুগের সাহিত্য পেরিয়ে আধুনিক যুগের সাহিত্যেও এর অবাধ বিচরণ। অবনীন্দ্রনাথের রচনাতেও আমরা প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ও বাগধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখতে পাই। কোথাও কোথাও তিনি প্রবাদের মূল রূপ অবিকৃত রেখেছেন, কোথাও কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছেন, আবার কখনো প্রবাদকে গানের আকারে তুলে ধরেছেন। নিম্নে আমরা তা তুলে ধরব।

শকুন্তলা ঃ

মহর্ষির তপোবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন — ''এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারো হিংসা করে না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাগে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। ...''[১]

আলোচ্য প্রবাদের মধ্য দিয়ে তপোবনের প্রাণীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিত্রই ফুটে উঠে।

''রাজার সেই সাতরাজার ধন এক
মানিকের-বরণ-আংটি কোথায় গেল!''[২]

এখানে আংটির মাহামূল্যবানতা বোঝাতে গিয়ে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজকাহিনী / শিলাদিত্য ঃ

''... তারপর আশি মন কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্যমূর্তিকে নিয়ে আর ননীর পুতুলের মতো সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নীচে চলে যেতে লাগল। ...''[৩]

আলোচ্য অংশে 'ননীর পুতুল' এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি বিলাসী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাম্বির ঃ

'রাজকাহিনী'র 'হাম্বির' অংশে যুবরাজ অরিসিংহ শিকার করতে বেরিয়ে পথে এক রাজপুতের মেয়েকে দেখে তার ভালো লেগে যায়। তারপরদিন রাজকুমারের দূত বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে মেয়ের বাবার কাছে গেলে মেয়ের বাবা কন্যাদানে অসম্মত হয়। এই অংশেই লেখক একটি প্রবাদের ব্যবহার

করেছেন — ''... এমন কাজও করে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? ...''[৪]

নিজের সিদ্ধান্তের ভুলে সুখের পথ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা আলোচ্য প্রবাদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

হাম্বিরের রাজ্যলাভ ঃ

''... রাণী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে — 'আমার কন্য রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।' ...''[৫]

কন্যার গুণ ও রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে আলোচ্য প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির প্রয়োগ ঘটেছে।

ভুতপত্রীর দেশ ঃ

এই রচনার 'হারুন্দের কথা' অংশে হারুন্দে হারুন বাদশা হয়ে কথককে মোগল সাম্রাজ্যের গল্প শোনাচ্ছেন। আর এখানেই আকবরের সাথে হারুন্দের কথা প্রসঙ্গে এসেছে প্রবাদের ব্যবহার।

''... কিন্তু ওই যে তোমার শাজাহানের ঔরঙ্গজেবটি, ওটি, ভাই; তোমার গোলাপবাগে কাঁটাগাছ। ও তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে।''[৬]

ঔরঙ্গজেবের হাতেই যে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ হবে তা ঐ প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রবাদটি ব্যবহার করে তিনি ঈঙ্গিতে সে কথাই বুঝিয়ে দিলেন।

''... আর অমনি ফটাস করে ভুঁইপটকার মতো ফেটে গেছে ব্যাঙের পেট, যেমন ফটাস করে শব্দ হওয়া আমনি দুটো ব্যাঙ পগার পার - ...''৭

এখানে 'পাগার পার' বাগধারা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাঙেদের দ্রুত পলায়ণ প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে।

আলেখ্য ঃ

''... সাহেব এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন — বাদশা বেগম দুজনকেই খুশি করিয়ে দিলেন - ...''[৮]

একটি মাত্র প্রয়াসের দ্বারাই মানুষ যখন দুটি কাজ হাসিল করে নেয়, তখন 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা' এই প্রবাদটির ব্যবহার হয়।

চৈতন্য চুটকি ঃ

''... সে একেবারে বিলিতি হাসি, তার চোটে হুজুরের পুরোনো মজলিস ঘরের দেওযাল চটে ফেটে চৌচির হয়ে হাওয়ার মুখে তাসের বাড়ির মতো ভেঙে পড়ল — ...''[৯]

এখানে 'তাসের বাড়ি' এই বাগধারাটি বাড়িটির ক্ষণভঙ্গুরতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

জেন্ত-সভা বা জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি ঃ

''... জলে কুমির ডাঙার বাঘ মেরে এদের নখের ইষ্টি-কবচ ধারণ করে আর আমাদের চর্বি মালিশ করে তারা নিজেদের গায়ের বাত সারাতে চলে। ...''[১০]

'জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ' এই প্রবাদটি উভয় সঙ্কট বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মহামাস তৈল ঃ

''হোলদারি বুট আর মাথামুণ্ডু নানান কাহিনী — এরি জোরে রামধন হয়ে উঠল দেশের একজন কেষ্টবিষ্টু। ...''[১১]

'কেষ্টবিষ্টু' এই প্রবাদ মূলক বাক্যাংশটি গণ্যমান্য অর্থে ব্যবহৃত হলেও তাতে থাকে ব্যঙ্গর খোঁচা।

আলোর ফুলকি ঃ

এই রচনায় অবনীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবাদের ব্যবহার করেছেন কাহিনীর প্রয়োজনে। কুঁকড়োর বউ খাকি 'পিউপিউ' ডাক শুনে কোথা থেকে ত এল জানতে ঘড়ির দিকে তাকায়। আর ''তখন চক্ষুশূল দুটো ঘড়ির কাঁটাই সে দেখতে পায়। ...''[১২] অপ্রিয় অর্থে 'চক্ষুশূল' প্রবাদটির ব্যবহার করা হয়।

নীল পায়রা পাহাড়তলিতে এসেছে কুঁকড়োর রূপ দর্শন করতে। এখানে এসে সে পেরুকে কুঁকড়োর জন্মস্থান দেখাতে বলতে পেরু তাকে বুড়ি মুরগির কাছে নিয়ে চলে, যে মুরগি কুঁকড়োর ডিমে তা দিয়েছিল। তারপর পেরুর মুখে কুঁকড়োর খুব বাড়বাড়ান্ত হয়েছে শুনে বুড়ি মুরগি একটা প্রবাদ উচ্চারণ করে — ''... পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে গো, ভাতে বাড়ে। ... ''[১৩]

আলোচ্য প্রবাদটি সমাজে বিশ্বাস অর্থে প্রযুক্ত হয়। পুরোনো জিনিস সবসময় কাজের হয় বলে তারা বিশ্বাস করে।

পায়রা কুঁকুড়োর দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়ে চড়াইয়ের খাঁচায় ডানার ঝাপটা মেরে গাঁয়ের দিকে উড়ে চলে যায়। তখন চড়াই এর মুখ থেকে একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয় — ''চড়াইটা গজ গজ করতে লাগল, 'সুঁড়ির জয় মাতালে কয়'। ...''[১৪]

তাল চড়াই আর ময়ূর কুঁকড়োর প্রধান শত্রু একথা জিম্মা - তাকে জানালে কুঁকড়ো একটি

প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলে উঠে — ''... পরের ধনে পোদ্দারি যার পেশা, ...''[১৫]

এর অর্থ হল অন্যের বলে বলীয়ান হয়ে শক্তিশালী হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করা। ময়ূর, চড়াই এদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতাই নেই, আর এরাই নাকি কুঁকড়োর ক্ষতি করবে। একথাই কুঁকড়োর কাছে হাস্যস্পদ বলে মনে হয়।

সকল পাখি ও জন্তু মিলে সভা বসায় কীভাবে কুঁকড়োকে জব্দ করা যায় তার আলোচনার জন্য। সেই মন্ত্রণাসভায় চড়াই এর যোগদানের কোনো বাধা থাকে না। পেঁচারা তাকে একটা শ্লোক বলে দেয় যা বললেই সেখানের দরজা খোলা পাবে — ''... চোরের মন পুঁই-আঁদাড়ে, ...''[১৬]

শাকের মধ্যে পুঁইকে নিয়ে নানা প্রবাদ প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। তেমনি একটি প্রবাদ — 'চোরের মন পুঁই-আঁদাড়ে'। চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থ জানতে পারলে চোর সহজেই পুঁই শাকের পাশে লুকোতে পারে। কেননা পুঁই শাকের ঝাড়ের বহুল বিস্তার দেখা যায়।

সমস্ত পেঁচা একস্থানে জড়ো হয়ে সভা শুরু করার আগে অন্ধকারের জয় দিতে থাকে —

''ঘুটঘুটে আঁধারে,
আমরা খুলি চোখ,
— যত লাল চোখ।
বুকে বসাই নোখ,
রক্তে গিলি ঢোক।
হাড় ভাঙি আর ঘাড় ভাঙি
আর দিই কোপ,
ঝোপ বুঝে কোপ।
আঁদাড়ে কোপ, পাঁদাড়ে কোপ।''[১৭]

এখানে উদ্ধৃত 'ঝোপ বুঝে কোপ' অর্থাৎ ঝোপ বুঝে কোপ মারা একটি প্রবাদ মূলক বাক্যাংশ। এর অর্থ হল সুযোগ মতো কাজ হাসিল করা। পেঁচারও সেই সুযোগের সন্ধানেই রয়েছিল।

আবার কাহিনীর একস্থানে চড়াই এর মুখ দিয়ে এই উপরিউক্ত প্রবাদ মূলক বাক্যাংশটির ব্যবহার ঘটেছে — ''... না আপনাকে অতি দীন অতি হীন বলে চালিয়ে যেমনি দিন এল বলে অমনি আলোর ফুল বলে চেঁচিয়ে উঠে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাওয়া যার তার কর্ম।''[১৮]

আলোর মর্ম চড়াই বুঝল না বলে কুঁকড়োর খুব দুঃখ হয়। সে বিভিন্ন কথায় চড়াইকে জানাতে

চায়। আর তখনই চড়াই এর মুখ দিয়ে প্রবাদ বেরিয়ে আসে — ''... তত্ত্বকথা এসে পড়ল শুনেই মনে হয় পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে, ...।''[১৯]

কুঁকড়োর গান শুনে ব্যাঙেরা এতটাই খুশি যে তারা আর স্বপন পাখির গান শুনতে চায় না। তাই তারা ঐ পাখির দফা রফা চায়। তখন কুঁকড়ো বলে ওঠে — ''... মশা মারতে কামান পাতবার কী দরকার।''[২০]

এটি একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ। অতি তুচ্ছ ব্যাপারে বড় প্রস্তুতি নেওয়া বোঝাতে এর ব্যবহার হয়।

বুড়ো আংলা ঃ

দুষ্টু ছেলে রিদয় গণেশকে কুঁড়োজাল দিয়ে চাপা দিলে গণেশের অভিশাপে সে যকে পরিণত হয়ে যায়। তখন ইঁদুর মটকা থেকে নেমে এসে রিদয়কে প্রবাদ বাক্য শুনিয়ে দেয় — ''... যেমন কর্ম তেমন ফল! এখন থাকোগে পাতালে যক্ হয়ে অন্ধকারে বসে! ...''[২১]

মানুষ যেমন কাজ করে তেমনি ফল পায় এই ভাবনাটিই উক্ত প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রিদয়ও তার দুষ্টুমির জন্য উচিত শাস্তি পেয়েছিল।

রিদয় হাঁসের পিঠে চড়ে চলে কৈলাসের পথে গণেশের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার মানুষ হয়ে ওঠার জন্য। যেতে যেতে তারা পাহাড়ের ঝরনার পাশে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও আছে ডালকুত্তার ভয়। ডালকুত্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে চকা বলে ওঠে — ''... সে জলের কুমির, ডাঙার বাঘ বললেই হয়। ...''[২২]

ডালকুত্তা যে জল ও ডাঙায় সমান ক্ষমতাশালী তা বোঝাতে গিয়েই লেখক এই প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন।

ডালকুত্তা এক সাদাহাঁসকে ধরতে গেলে রিদয় তার হাতে এমন দাঁত বসিয়ে দেয় যে সে — ''... চোখে আমি সরষেফুল দেখলুম! কুত্তা তার থাবা চাটতে বসে গেল।''[২৩]

'চোখে সরষেফুল দেখা' প্রবাদটি বিপন্ন বোধ করা অর্থে ব্যবহার করা হয়।

''যেখানে সেখানে শোও আর খাও
পৃথিবীটা ঘিরে চক্কর দাও
শেষে একদিন অকস্মাৎ!
বিনি মেঘে বজ্রপাত।''[২৪]

এটি একটি প্রবাদ মূলক বাক্যাংশ। কোন প্রকার পূর্বাভাস ছাড়াই সর্বনাশ ঘটবে এই অর্থে এটির প্রয়োগ ঘটে।

''বামুন গেল ঘর তো লাঙুল তুলে ধর, ...''[২৫] — কর্তার অনুপস্থিতিতে কাজে ফাঁকি দেওয়া - এই অর্থে প্রবাদমূল বাক্যাংশটির প্রয়োগ ঘটে।

''... ওই বাপ-মা হারা আমার শিবরাত্রির সলতে ওই ছোটো নাতিটি বেঁচে থাক, ...''[২৬] — একমাত্র সম্বল এই অর্থে 'শিবরাত্রির সলতে' প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির প্রয়োগ দেখা যায়।

বাদশাহী গল্প ঃ

এখানে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নাতি বাদশা অর্থাৎ সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সামনে রেখে যেন একের পর এক গল্প বলে চলেছেন। এখানে লেখকের অদ্ভুতুড়ে মনই ধরা দিয়েছে। এই রচনাতেও আমরা প্রবাদের ব্যবহার দেখতে পাই — ''... আমি সাধু হয়ে তার কাটা ঘায়ে তত নুনের ছিটে দিই - তাই তো, ...''[২৭]

'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' প্রবাদটি এক যন্ত্রণার উপর অন্য এক নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়া এই অর্থে প্রয়োগ ঘটে।

এই রচনায় 'ঠোঁটকাটা' - এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির দুবার প্রয়োগ ঘটেছে —

ক) ''তবেই হয়েছে, সে ঠোঁটকাটা এখন কর্ত্তাগিন্নির মত তোমার নামে ছড়া বেঁধে ফেলেছে।''[২৮]

খ) ''ঠোঁটকাটা ঝাঁকা মুটে এয়েচে?''[২৯]

অপ্রিয় অথচ স্পষ্ট বক্তা — এই অর্থে 'ঠোঁটকাটা' প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির প্রচলন দেখা যায়।

কানকাটা রাজার দেশ ঃ

এই দেশে রাজা ছাড়া আর প্রায় সকলেরই কান কাটা ছিল। সেই রাজা একদিন শিকার করতে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় রাগে হুনুমান তার একটি কান ছিঁড়ে দেয়। তখন রাণী কানের বিষয়ে জানতে চাইলে রাজা একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেন —

''রাজা বললেন — 'তা হোক, কাটা কানের থেকে কালো কান ভালো। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।'''[৩০]

একেবারে কিছু না থাকা অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ থাকাও যে ভালো এই কথাই প্রবাদটির মধ্য

দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

যাত্রার ফর্দ ঃ

এই অংশে একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশের প্রয়োগ ঘটেছে — ''... আর একটা উড়ে গোঁসাই গোছের ফোটাকেট গৌরচন্দ্রিকা শুরু করেছে ঃ ...''[৩১] এটি ভূমিকা বা ভণিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সিকস্তি পয়স্তি কথা ঃ

''— 'ধান ভানতে শীবের গীত!' বলেই খাতাঞ্চি হুকো মুখে করলেন।''[৩২] অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপন প্রসঙ্গে 'ধান ভানতে শীবের গীত' — এই প্রবাদটির ব্যবহার ঘটে।

হেতি হোতির বৃত্তান্ত ঃ

''... ইঁচড়ে পাকা কাঁঠাল আর মাকাল যেমন, ...''[৩৩] — অকালে পেকে যাওয়া অর্থে 'ইঁচড়ে পাকা' বাগধারাটি ব্যবহার হয়।

বহিত্র ঃ

এই আখ্যানে চাঁইবুড়ো পুঁথি পাঠ শুরু করতে বসে একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার করেছেন — ''শিবরাত্রি সল্‌তে জ্বলতে না জ্বলতে কুম্ভকর্ণের দুটো ছানা হয়ে লেগেছে চলতে আর বলতে।''[৩৪]

কলা বনের কলা ঃ

''— আচ্ছা, ঘুঁটে যখন পোড়ে গোবরের হাসি তো দেখেছিস?''[৩৫] একের দুর্দশায় অন্যের আনন্দ লাভ করা অর্থে 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে' এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির ব্যবহার হয়।

এই রচনায় অপর একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ 'পরের ধনে পোদ্দারি'-র ব্যবহার চোখে পড়ে।

''আঁক, ছিঁড়বি নাক!
আয় মাখবি পাঁক।
রোস তো পেটে দাঁত ঝাড়ি।
পরের ধনে পোদ্দারি।''[৩৬]

উপরামায়ণ ঃ

''... এই সময় নারদের সঙ্গে দেখা — একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।''[৩৭] সাপেরা ধুনার ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না বলে মনসা পুজোয় ধুনোর ব্যবহার নিষিদ্ধ। প্রবাদটির মধ্য দিয়ে এই নিষেধাজ্ঞাই

প্রকাশ পেয়েছে। আর তার পরেও যদি কেউ তার ব্যবহার করে, তবে তার যে ক্ষতি সাধন হবে, তাও যেনো এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এই রচনায় আরো একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার হয়েছে — ''তীর্থের কাকের প্রায়, ...''[৩৮] পরানুগ্রহ প্রত্যাশী লোভাতুর ব্যক্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে এই বাক্যাংশটির ব্যবহার করা হয়।

পথে বিপথে / টুপি ঃ

পথে বিপথে'র 'টুপি' নামক অংশে কথক বিকেলে বেড়িয়ে আসার জন্য যে স্টীমারে চেপেছিলেন তাতে অতিরিক্ত লোক ওঠার কারণে পা ফেলবার জায়গা ছিল না। তার সাথে ছিল অর্ডার দেওয়া নানা দ্রব্য, যেগুলি প্রতি ঘাটে স্টীমারে এসে বোঝাই হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গেই কথক একটি প্রবাদ বাক্যের উচ্চারণ করেছেন —

''... এর উপরেও বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো কোন গৃহিনীর ফরমাস দেওয়া আপিসের ফেরতা মার্কেটের ফুলকপি, ...''[৩৯]

ভারের উপর ভার বোঝাতে 'বোঝের উপর শাকের আঁটি' প্রবাদটির ব্যবহার হয়ে থাকে। আলোচ্য অংশেও স্টীমারের ভিড়ের পর আরো মাল ওঠা প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কথক স্টীমারের দমবন্ধ করা রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির কথাই তুলে ধরেছেন।

ইন্দু ঃ

এই অংশে কথক একটি কাহিনী বলতে শুরু করার আগে 'মেঘ না চাইতে জল' এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির ব্যবহার করেন — ''... যেমন মেঘ না চাইতে জল, এবং খালি জল চাইতে যেমন জল খাবারের থালা; ...''[৪০]

অনিশ্চিত প্রাপ্তির স্থানে আশার অতিরিঞ্জ প্রাপ্তি বোঝাতে গিয়ে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

ছাইভস্ম ঃ

''... আমি জড় ভরতের মতো জল থেকে উঠে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে দেখি পায়ে ধুলো নেই। ...''[৪১]

জড়োর মতো অবস্থানকারী বোঝাতে 'জড় ভরত' প্রবাদটির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার ভরত নামে এক পৌরাণিক চরিত্রের নামও পাওয়া যায়। যার নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়েছে — এমন বিশ্বাস কেউ কেউ করে থাকেন।

''আকাশ কুসুমের মতো দেখালেও ডারবিখেলার ঘড়াভরা অর্থলাভের সদুপায় যে তাঁরই দ্বারা হতে পারবে, ...''[৪২]

অবাস্তব সুখ কল্পনা অর্থে 'আকাশ কুসুম' বাগধারাটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

মাসি ঃ

এই গল্পে অবু তার মাসিকে দুলাল কীভাবে ইন্‌স্পেক্‌টরের মেডেল পেল তা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি প্রবাদ উচ্চরণ করে — '' 'আজ্ঞে; যেমন বোঝার উপর শাকের আঁটি।' ...''[৪৩]

আর তার পরেই অবুর মাসি এইসব ছেলেদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'হুঁচড়ে-পাকা' বাগধারাটি ব্যবহার করে — ''... হুঁচড়ে পাকা তারে কয়।''[৪৪]

''চাঁইবুড়ো মন্তর পড়েন, পুকুর-জলে দাঁড়িয়ে - 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ - যাবৎ পিবেৎ তাবৎ জীবেৎ।' ...''[৪৫]

এটি একটি সংস্কৃত প্রবাদ। যতদিন বাঁচো ঋণ করে ঘি খেয়ে সুখে বাঁচো। এটি চার্বাকদের মত। লেখক একটু ঘুরিয়ে প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন।

কোটরা ঃ

মাচারুর রাস্তা থেকে তুলে এনে মানুষ করা ছেলে নোটো যে মুকুন্দের সন্তান তা পরে জানা যায়। তাই পোস্টমাস্টার মাচারুকে বলে নোটোকে মুকুন্দের কাছে পৌঁছে দিতে। তখন মাচারু আর একদিন নোটোকে তার কাছে রাখবে বললে পোস্টমাস্টার একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে — ''মাস্টার ঘার নেড়ে বলেন — 'আর দেরি নয় মাচারু, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে!' ''[৪৬]

সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না। আলোচ্য প্রবাদের মধ্য দিয়ে সে কথাই মাচারুকে বোঝাতে চেয়েছেন পোষ্টমাস্টার।

মারুতির পুঁথি ঃ

ব্রহ্মার বর পেয়ে রাবণ অত্যাচার শুর করলে হনুমান আকাশ থেকে বাণী নিক্ষেপ করলেন সব দেবতাদের বানর হয়ে জন্মাবার জন্য। তাই বানরীদের বিয়ে করে দেবতারা রাম কার্যে সাহায্য করুক। সেই বার্তা নিয়ে নারদ দেবমাতা অদিতির কাছে দেবতাদের বিয়ের অনুমতি চাইতে গেলে অদিতি মুনি প্রজাপতির মত আগে নিতে বলেন। তখন নারদ একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ উচ্চারণ করেন —

''— 'তবে মা, জেনে-শুনে এমন কথাব বলা কেন? মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম হয়ে থাকে — কিন্তু মার অনুমতি না হলে ছেলের বিয়ে দেওয়া প্রাজপতিরও কর্ম নয়। ...''[৪৭]

সাধারণ মানুষের মতো মুনিঋষিদেরও মাঝে সাধে মতিভ্রম হয়। তাই নারদ প্রজাপতি মুনি কি বলবে কি না বলবে তার আগে মার কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি নিয়ে নিতে চেয়েছেন।

দেবতারা সব বর সজ্জায় সেজে যখন কিষ্কিন্ধ্যায় বিয়ে করতে যাবে তৈরী হয়ে গিয়েছে, তখনই পবন এসে জানায় এ ব্যাপারে রাবণকে চিঠি লিখে ছুটি নেওয়া দরকার। কেননা সে দেবতাদের অন্নদাতা, আর তখনই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে একটি প্রবাদ উচ্চারিত হয়েছে — ''যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। ...''[৪৮]

মানুষ যে বক্তি বা পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যেতে চায়, যদি তাকে ঘটনাচক্রে তারই মুখোমুখি হতে হয়, তখন এই প্রবাদটির ব্যবহার হয়ে থাকে। যে রাবণের জন্য সবাই ভীত, তারই কথা পবন উচ্চারণ করায় ব্রহ্মার মুখ থেকে এই প্রবাদটি বেরিয়েছে।

হনুমানের কিছু কিছু কলাবিদ্যা শেখা হয়েছে দেখে চন্দনগিরি খুশি হয়ে তাকে বহুরূপী বিদ্যা দান করেন, যাতে করে হনুমান — ''... সুচ হয়ে ঢুকতে পারেন, ফাল হয়ে বার হতে পারেন - যথেচ্ছা, যথা সুখে। ...''[৪৯]

আলোচ্য প্রবাদটির মধ্য দিয়ে হনুমানের যখন যেখানে খুশি যাওয়া বা নিজেকে বদল করে ফেলার কথা বলা হয়েছে। আবার এই প্রবাদটির একটি ব্যাঙ্গাত্মক অর্থও আছে। একটু সুযোগ আদায় করতে চেয়ে পরে আরো অনেক বেশী সুযোগ দাবী করে বসার ভাবনা।

চাঁইবুড়ো হনুমানের মন্তব্য দিয়ে পুঁথি পাঠ করতে বসে একটি প্রবাদ উচ্চারণ করলেন —

''নাক কাটিলে কাঁদিতে বসা,
কাটা ঘায়ে কেবল লবন ঘসা। ...''[৫০]

এর সঙ্গ তুলনীয় একটি প্রবাদ হল — 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।'

''হনু ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে, যেখানে ছিলেন সেই খানেই দাঁড়িয়ে রোদ পোহাতে থাকলেন।''[৫১] — এটি একটি সংস্কৃত প্রবাদ। যদিও বাংলাতেও এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

''আঙুল ফুলে কলাগাছ কিনা সেটাও এঁচো ভাই। ...''[৫২] — ছোটো থেকে হঠাৎ বড়ো হওয়া প্রসঙ্গে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' - এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির ব্যবহার করা হয়।

সুগ্রীবের নির্দেশে সীতাকে খুঁজতে বেরিয়ে কোথাও না পেয়ে বানরগণ ভয়ে পাতালে প্রবেশ করে। আর সেখানে গিয়ে না খেতে পেয়ে গবাক্ষ — ''আমি তো চক্ষে দেখিতেছি সরিষাক্ষেত্র!''[৫৩] — এই প্রবাদটির উচ্চারণ করে। এর সঙ্গে তুলনীয় একটি প্রবাদ হল — 'চোখে সরষে ফুল দেখা।'

হনুমানের সঙ্গে সম্পাতির দেখা হলে সম্পাতি তাদেরকে রাবণ সীতাকে যেখানে বন্দি করে রেখেছে তার ঠিকানা জানায়। তখন তারা সবাই সাগরের কূলে এসে বিশ্রাম নেয়। আর সম্পাতি তাদেরকে প্রবাদ বাক্য শোনায় — '' 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই করি শ্রবণ, ...''[৫৪] — বাণিজ্য করতে গেলে যে লক্ষ্মী লাভ হয়, প্রবাদটিতে সেই কথাই বলা হয়েছে।

সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে বানরগণ আর কেউ সাহস করে না সাগর পাড়ি দিতে। সবাই তখন হনুমানকেই এ কাজে যোগ্য বলে বিবেচিত করে। আর তখন হনুমানের গীতের মধ্য দিয়ে একটি প্রবাদ উচ্চারিত হয় —

''এখন হয়েছি কাজের কাজি
কাজ ফুরোলে হব পাজি ...''[৫৫]

স্বার্থসিদ্ধি বা কাজ উদ্ধারের জন্য মানুষ খুব তোষামোদ করে, কিন্তু কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। উক্ত প্রবাদটির মধ্য দিয়ে এই ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে।

চাঁইবুড়োর পুঁথি ঃ

রামায়ণের কাহিনী নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একাধিক পুঁথি লিখেছিলেন। তেমনি এক কাহিনী 'চাঁই বুড়োর পুঁথি'। পুঁথিটি শুরু হয়েছে একটি প্রবাদ দিয়ে — ''বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো পেট - সবাই লঙ্কা ডিঙোতে মাথা করলেন হেঁট, ...''[৫৬]

— এর সঙ্গে একটি তুলনীয় প্রবাদ হল —

''বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো পেট।
লঙ্কা ডিঙ্গোতে সব মাথা করে হেঁট।''

কোনো শক্তিশালী মানুষ যখন তার উপযুক্ত কাজ করতে ব্যর্থ হয় তখন এই প্রবাদটি উল্লিখিত হয়। হনুমান সাগর পার হতে লাফ দেওয়ার পর তাকে বানরগণ আর দেখতে না পাওয়ায় তাদের এমন মনে হয়েছিল।

''এই বলে চাঁইবুড়ো পুথি পাঠ বন্ধ করে অগস্ত্যযাত্রা করলেন দক্ষিণ মুখে সেই রাত্রেই। ...''[৫৭] — শেষ যাত্রা এই অর্থে 'অগস্ত্যযাত্রা' - প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

সূর্পণখা মা নিকষার কাছে একাদশীর দিন মুরগির ডিম খেতে চাইলে নিকষা বলে উঠে — ''... আবার বলে কিনা - মুরগীর ডিম, ঘোড়ার ডিম আজ অদৃষ্টে! ...''[৫৮] — অলীক বস্তু এই অর্থে 'ঘোড়ার ডিম' বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বা বাগধারাটির ব্যবহার হয়।

''... ধর্মবাপ পূর্বমুনির আখড়ায় পৌঁছে রাবণ শুনলেন মান্ধাতার আমল শেষ হয়ে গেছে। ...''[৫৯] — অত্যন্ত প্রাচীন এই অর্থে 'মান্ধাতার আমল' প্রবাদটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

চাঁইবুড়ো পুনরায় পুঁথি পড়া শুরু করার পূর্বে একটি প্রবাদ উচ্চারণ করেন — ''... একটি আমলকী দেখে, 'ওল, কচু, মান তিনই সমান' বলে চাঁইবুড়ো কথারম্ভ করলেন।''[৬০]

একই প্রকার হীন বস্তু বা ব্যক্তিদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না বোঝাতে 'ওল, কচু, মান তিনই সমান' প্রবাদটির ব্যবহার হয়।

রাবণ কিষ্কিন্ধ্যা থেকে ফিরে এসে কুম্ভীনসী চুরি গিয়েছে শুনে — ''... রাবণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলেছেন — ...''[৬১] — হঠাৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া বোঝাতে 'তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা' প্রবাদটির ব্যবহার হয়ে থাকে। রাবণেরও কুম্ভীনসী চুরি গিয়েছে শুনে ঐ অবস্থা হয়েছিল।

রাবণ রাজা সাতাশ হাজার ভগ্নীর বিয়ে দেবে বলে ছেলে খোঁজার জন্য ঘটক ঘটকী লাগিয়ে দেয়। তারপর ঘটক ঘটকী এক ব্রহ্মাদিত্যকে রাবণের বোনদের বিয়ে করার কথা বললে সে রাজি হয় না। তখন ঘটক ঘটকী বলে উঠে — '' 'বেল পাকলে কাকের কী?' বলে ঘটক ঘটকীর অন্যত্র গমন।''[৬২]

যার জন্য নিজের কোনো লাভ হবে না বা যা নাগালের বাইরে তার ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা করা বৃথা। 'বেল পাকলে কাকের কী?' — প্রবাদটির মধ্যে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

মহাদেবের কথায় রাবণ চলল কুবেরকে জয় করতে। যে কুবের পুরীর মালিক একদিন রাক্ষসেরাই ছিল। তারপর সেই স্থানে কুবের ও তার নেউল কী করে প্রবেশ করল মহোদর তা মালিকান রাক্ষস এর কাছে জানতে চাইলে সে বলে উঠে — '' 'ওগো, কুবেরেটা উড়ে গিয়ে জুড়ে বসল, আর তার নেউলটা ভুই ফুঁড়ে উঠে পড়ল সেখানে নিশ্চয়। ...''[৬৩]

এই প্রবাদটির সঙ্গে একটি তুলনীয় প্রবাদ হল — 'উড়ে এসে জুড়ে বসা'। হঠাৎ এসে বিনা অধিকারে কোনো কিছুর সর্বেসর্বা হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে প্রবাদটির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

কুবের স্বর্ণলঙ্কাতে বসে যখন সোনমুগের নাড়ু খেয়ে চলেছে তখন সে শুনতে পেল রাক্ষসদের রণবাদ্যের শব্দ —

''যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই,
পরের ধনে পোদ্দারি কতকাল সই।''[৬৪]

'পরের ধনে পোদ্দারি' একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ।

রাবণ মামা কালনেমিকে হরধনু ভঙ্গ করতে যাবে বলে মামা তাকে যেতে নিষেধ করে। তারপর বলে —

''মামার ভাগ্নে, ভাগ্নের মামা —
তুমি ভরো ধামা, আমি ভরি সামা,
মরদ কি বাত হাতি কি দাঁত।''[৬৫]

এর সঙ্গে তুলনীয় একটি প্রবাদ হল - 'হাতি চিনি দাঁতে, মরদ চিনি বাতে।' হাতির পরিচয় যেমন তার দাঁতে, ঠিক তেমনি ভালো মানুষের পরিচয় ধরা পড়ে কথা দেওয়া ও সে কথা রক্ষা করার মাধ্যমে।

সীতার স্বয়ম্ভর সভায় কোন কোন রাজা গেছেন রাবণ তা শুকসারণ এর কাছে জানতে চায়। তখন শুকসারণ বলে —

'' 'আজ্ঞে নামেতেই প্রকাশ - দুর্বল, শুষ্কল, মোট্টাল অনেক প্রকারেরই এসেছেন; ... কিন্তু কারু সাধ্য হয়নি ধনুকভাঙা পণ ভঙ্গ করে সীতাকে কাড়তে।''[৬৬]

কঠিত প্রতিঙ্গা এই অর্থে 'ধনুকভাঙা পণ' প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির ব্যবহার চোখে পড়ে।

মহাবীরের পুঁথি ঃ

বীরবাহুর বান্ধর্ববাণ এ আহত হয়ে জাম্বুবান, হনুমান রামের পায়ের কাছে এসে পড়লে, রাম যুদ্ধ না করে বানরগণকে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যেতে বলে। তখন বিভীষণ একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ উচ্চরাণ করে — ''এ ভব সংসার দেখি অকূল পাথার হবে না কার্য সিদ্ধি করে মিষ্ট ব্যবহার।''[৬৭]

সমূহ বিপদ আর্থে 'অকূল পাথার' প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির কথা আসে। সংসারের সর্বত্রই যে বিপদ ছড়িয়ে রয়েছে — একথা বিভীষণ রামকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

ভাস্মলোচন বধের পর রাম লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিৎকে বধ করবার জন্য লঙ্কায় যেতে বলেন। তখন লঙ্কায় একাধিক বানরের যাওয়ার কথা উঠলে জাম্বাবানের মুখ দিয়ে একটি প্রবাদ উচ্চারিত হয় —

''এতজনে একজনে মারা অবিচার
দুজনে দুজন মার, এই যুক্তি সার।
লক্ষ্মণ মারুণ ইন্দ্রজিৎ, হনু ভাঙুন দ্বার,
বিভীষণের ভার পথ দেখাবার

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট,

মারে নাই এ কথার।''[৬৮]

কোনো ব্যাপারে একাধিক লোক কর্তৃত্ব করলে কাজটি যে পণ্ড হতে পারে, 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' - এই প্রবাদটি প্রয়োগ করে জাম্বুবান যেন সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

শিবসদাগর ঃ

এই নাটিকাতে একটি প্রবাদের উল্লেখ মেলে — ''শিব-বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।''[৬৯]

রং-বেরং ঃ

'রং বেরং' নাটিকাতে 'জড় ভরত' এই প্রবাদ এর ব্যবহার দেখা যায় —

''বাবুই কোথায় হে তাল চড়াই,

জড়-ভরতটি হয়ে রইলে কেন?''[৭০]

নোয়াম কিস্তি ঃ

''নোয়া - মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মেরে কী লাভ?''[৭১] — ব্যথিতকে আরও বেদনা দেওয়া এই প্রসঙ্গে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' প্রবাদটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

ধরাপড়া ঃ

''গোঁসাই — শুক আমার সবে ধন নীলমণি। একে তো আমি প্রাণ ধরে সেই কংসের মথুরায় পাঠাতে পারব না।''[৭২] — একমাত্র সম্বল অর্থে 'সবে ধন নীলমণি' প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির প্রয়োগ ঘটে।

উড়নচণ্ডীর পালা ঃ

এই পালার কাউয়ার গীত অংশে তিনি একটি প্রবাদের ব্যবহার করেছেন —

''চাচা আপাতত জানটা তো বাঁচা

আগে ভাগে চম্পট দিয়ে

চালচুড়ো ছেড়ে, চালছিঁড়ে নিয়ে

দৌড় দেও না চোঁচা ...''[৭৩]

এর সাথে তুলনীয় একটি প্রবাদ হল 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

কাক ও কূর্মের কথোপকথনে এসেছে একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার — ''কূর্ম, কেউ এ পর্যন্ত ফিরেছে দেখেছ — ওহে ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ, তা হলেই অগস্ত্য যাত্রা বুঝলে।''[৭৪]

কঞ্জুষের পালা ঃ

''টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা না রহে কোনো জ্বালা,
বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা।''[৭৫]

অপব্যয় করা অর্থে 'ভস্মে ঘি ঢালা' প্রবাদমলূক বাক্যাংশটির ব্যবহার ঘটেছে।

গজ-কচ্ছপের পালা ঃ

গজের গীতে একটি প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায় —

''শেষ দেখা এই জন্মশোধ
মাথা ঘুরছে গিলতে ঢোক
সর্ষে ফুল দেখছে চোখ।''[৭৬]

প্রবাদটি হল 'চোখে সরষে ফুল দেখা'।

লম্বকর্ণ পালা ঃ

রাজশেখর বসুর 'লম্বকর্ণ' গল্প অবলম্বনে তিনি এই পালাটি লেখেন। বংশলোচন বাবু বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়ে রাস্তা থেকে একটি পাঁঠাকে বাড়িতে নিয়ে এলে স্ত্রী তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। তখন বংশলোচনের বন্ধু চাটুয্যে ছাগলকে বিদায় দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নিতে বলে। সে বলে —

''চাটুজ্যে, ব্যাটা ঘর-ভেদী বিভীষণ — তোমারই বা অত মায়া কেন ওটার ওপর। কেটে খেতে না চাও — বিদায় করে দাও। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করো না দাদা।''[৭৭]

যার উপর নির্ভর করতে হয় তার অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করা আদতে নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনে। 'জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা' — প্রবাদটির মধ্য দিয়ে সেই ধারণাই ব্যক্ত করেছে চাটুজ্যে মশায়।

চাটুজ্যের কথায় সায় দিয়ে বংশলোচন একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে — ''বংশ। ওঁরা যান, তুমি বোসো, কটা পরামর্শ নিই, তোমার কাছে। দু নৌকায় পা দেওয়া ভাল নয়, কী বল মুন্সী সাহেব? আজ সন্ধ্যা বেলায় যথাবিহিত করবই — যা থাকে কপালে। ...''[৭৮]

উভয় দিক রক্ষা করে চলা এই অর্থে 'দু নৌকায় পা দেওয়া' প্রবাদটির ব্যবহার হয়ে থাকে। বংশলোচন বাবুরও একদিকে স্ত্রীর কথা শোনা, অপর দিকে ছাগলকে বাড়িতে রাখা — এই দুই কাজ সম্ভবপর হচ্ছিল না।

হংসনামা ঃ

'হংসনামা' পালায় যাত্রা দলের অধিকারী একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে — ''অধিকারী। আরে, আমার কাছে চায় সোডা, লেমেনেড, পানের পয়সা! আমি কি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছি? আবার রাগ দেখো! ...''[৭৯]

'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' — প্রবাদটির অর্থ হল পণ্ডশ্রম করা। যাত্রাদলের অধিকারি যা করতে চান নি।

হংসমুষিক এসে ভীমের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলে ভীম একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলে ওঠে — ''ভীম। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না ভীম। আমার এই গদাটা উল্টে ফেলো দেখি। ...''[৮০]

ভীম বড়ো বীর। তাই হংসমুষিকের মতো ক্ষুদ্র প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করতে সে ইচ্ছুক নন। 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা' প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির মধ দিয়ে ভীম সে কথাই বুঝিয়ে দিয়েছে।

এসপার ওসপার ঃ

'এসবার ওসপার' পালায় নহুষ একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে — ''মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিয় না। ...''[৮১]

ব্যথিতকে আরও বেদনা দেওয়া - এই অর্থে 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' প্রবাদটির ব্যবহার হয়।

জাবালির পালা ঃ

ঘৃতাচীর নৃতগীত শুনে জাবালি বলে ওঠে — ''... এই বসন্ত, এই বিষ্টি, এই ধান ভানতে শিবের গীত! অয়ি বরাননে তুমি কে? ...''[৮২]

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপন অর্থে 'ধান ভানতে শিবের গীত' - প্রবাদটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। ঘৃতাচীর নাচ-গানের অর্থ জাবালির কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল।

জাবালিকে কী উপায়ে সংহার করা যায় দেবতারা সব ভেবে না পেয়ে মনুর স্মরণাপন্ন হলে মনু জাবালির উপর বিষ প্রয়োগ করতে বলে। কিন্তু কে প্রয়োগ করবে তা নিয়ে বলতে গিয়ে নারদ প্রবাদ উচ্চারণ করে — ''... বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধে কে, তাই ভাবো।''[৮৩]

দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে গিয়ে অনেকেই ভয়ে বা লজ্জায় পিছিয়ে আসে। 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা' - প্রবাদটির মধ্য দিয়ে এই ধারনাই নারদ প্রকাশ করেছে।

দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা ঃ

''... সরষে ফুল দেখিতেছি চক্ষে থাকি থাকি।''[৮৪] — 'চোখে সরষে ফুল দেখা' - প্রবাদটি অবনীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক রচনায় ব্যবহার করেছেন।

যাত্রা গানে রামায়ণ ঃ

'রামায়ণ' এর কাহিনী অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথ 'যাত্রাগানে রামায়ণ' পালাটি লেখেন। এখানেও তিনি একাধিক প্রবাদ এর ব্যবহার করেছেন। ''বদ্যিনাথের ষাঁড়। থেকে বলদ না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল। ...''[৮৫]

এর সঙ্গে তুলনীয় প্রবাদ হল — 'থাকতে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল'। গরু থেকেও যদি হালের কাজে না লাগে তবে চাষীর দুর্দশাই বাড়ে।

নিষাদের নৃত্যগীত এ একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ব্যবহার হয়েছে — ''... একখানা কঞ্চি দুইখান কঞ্চি, বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড় ...''[৮৬]

কর্তার চেয়ে অধস্তন কর্মচারীর কর্তৃত্ব বেশি বোঝাতে গিয়ে 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' - প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির ব্যবহার হয়।

কুম্ভকর্ণ স্বর্গপুরীতে গিয়ে ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলে ইন্দ্র বজ্র মেরে কুম্ভকর্ণকে সংহার করবে জানায়। তখন কুম্ভকর্ণ একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি উচ্চারণ করে — ''কুম্ভকর্ণ। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো দেখে দধীচি বুড়ো, দন্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুঁড়া।''[৮৭]

কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করতে এসে নিদ্রামগ্ন হয়ে গেলে রাবণ যুদ্ধ করতে আসে। যমের চৌষট্টি রোগ রাবণের শরীরে প্রবেশ করলে রাবণ জ্বালায় ছটপট করে। তখন দেবগন একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে —

''... মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, যত পার দিতে
রাক্ষস হয়ে দেবগণে এসেছে জিনিতে। ...''[৮৮]

অযোধ্যাবাসীদের গীতে একটি প্রবাদের ব্যবহার ঘটেছে — ''সাত ঘাটের জল খেয়ে এসে পড়েছি অযোধ্যায় মণ্ডা মেঠাই খান বলে কাল সকালে।''[৮৯]

খুব নাকাল হওয়া অর্থে 'সাত ঘাটের জল খাওয়ানো' — প্রবাদটির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

''আরে সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস

আরে জলের কুমির ডাঙায় বাঘ।''[৯০]

উভয় সঙ্কট বোঝাতে 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' - প্রবাদটির দেখা মেলে। এছাড়াও যে সমস্ত প্রবাদগুলি এখানে দেখা যায় তা হল —

ক) ''সরষে ফুল দেখিতেঠি চক্ষে থাকি থাকি।''[৯১]

খ) ''বরঞ্চ ভাঙিব, তবু না হইব নত, ...''[৯২]

এর সঙ্গে তুলনীয় একটি প্রবাদ হল — 'ভাঙে তুব মচকায় না।'

গ) ''গেঁয়ো যোগী গাঁয়েতে যাও দেখো যদি ভিখনা পাও।''[৯৩]

এর সঙ্গে তুলনীয় প্রবাদ — 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না'। প্রবাদটির অর্থ হল আশেপাশের অতি পরিচিত ব্যক্তি বিশেষ গুণী হলেও যোগ্য মর্যাদা পায় না।

ঘ) ''ঝোপ বুঝে মারা যাবে কোপ।''[৯৪]

ঙ) ''... ডুবে ডুবে এসো জল খাবে তলে তলে। ...''[৯৫]

এর সঙে তুলনীয় প্রবাদ হল — 'ডুবে ডুবে জল খায় শিবের বাবাও টের না পায়।'

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ঃ

এই প্রবন্ধের 'জাতি ও শিল্প' প্রবন্ধে জাতির সঙ্গে শিল্পকলার সম্বন্ধ বলতে গিয়ে 'পরের ধনে পোদ্দারী' এই প্রবাদটির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন — ''জাতির সঙ্গে জাতীয় শিল্পকলার সমস্তর সম্বন্ধ কালিদাসের রাজার প্রজারা 'স পিতঃ' গোছের নয়, 'পরের ধনে পোদ্দারী' করার সঙ্গে তার মিল আছে।''[৯৬]

এই প্রবন্ধের 'সন্ধ্যার উৎসব' অংশে তিনি একটি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন — ''... 'খায় দায় পাখিটি বনের দিকে আঁখিটি।' ...''[৯৭]

'খেলার পুতুল' অংশে যে প্রবাদটির উল্লেখ পাই তা হল — ''ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার, ...''[৯৮]

ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ ঃ

এই প্রবন্ধে আমরা এক প্রবাদের উল্লেখ পাই — ''... কথায় বলে, 'যারে দেখতে নারী তার চলন বাঁকা!' ...''[৯৯]

কালোর আলো ঃ

''... ঘুমপড়ানো গান ঘুম আনিবার উপায় মাত্র, রঙিন ঝুমঝুমিটা কান্না ভুলাইবার জন্য মাতৃস্নেহের একটা — নাই মামার চেয়ে কানা মামা গোছের প্রতিচ্ছায়া।''[১০০]

এখানে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' - প্রবাদটির একটু পরিবর্তন করে লেখক ব্যবহার করেছেন।

রস ও নীরস ঃ

''এই ভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারার নিয়ম এখনো ঐতিহাসিকদের মধ্যে চলে এসেছে।''[১০১] একসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা এই ভাব বোঝাতে উক্ত 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা' প্রবাদটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

নূতনে পুরাতনে ঃ

তিনি এই প্রবন্ধে দুটি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন —

ক) ''পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে, একথা সকলেই মানে।''[১০২]

খ) ''... ঘর-পোড়া গরুর মতো সে সিঁদুরে মেঘ দেখেও আঁতকে উঠে। ...''[১০৩]

এখানে 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়' — এই প্রবাদটি একটু পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

খুদ্দুর যাত্রা ঃ

সূর্পণখার নাক কান কাটার প্রতিশোধ নিতে রাবণ চলেন সীতা হরণ করতে। এদিকে কুম্ভকর্ণের কোনও হেলদোল নাই দেখে সূর্পণখা তার স্ত্রী বিলোচনার তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা তোলে। তখন কুম্ভকর্ণ একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে —

''কুম্ভকর্ণ।। ফের বিলোচনার কথা, কি বলবো তোর নিজের নাক কান গেছে কাটা পরের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে এলি এখন! ...[১০৪]

এক যন্ত্রণার উপর আর এক নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়া অর্থে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' - প্রবাদটির ব্যবহার হয়। এখানে সূর্পণখা কুম্ভকর্ণের স্ত্রীর পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কুম্ভকর্ণের যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

হনুমানকে কাজের কথা বলতে গিয়ে জাম্বুবান একটি প্রবাদ উচ্চরাণ করেছে — ''জাম্বুবান।। দুই পাখি মারা চাই এক ঢিলে।''[১০৫]

সমুদ্র পার হয়ে সীতার খবর কে আনবে অঙ্গদের এই প্রশ্নের কেউ কোনো সাড়া না দিলে জাম্বুবান তার কারণ জানতে চায়। তখন মর্কট একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে — ''মর্কট।। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট - লঙ্কা ডিঙাতে মাথা করে হেঁট।''[১০৬]

যখন কোনো ব্যক্তি তার উপযুক্ত কার্য সাধনে ব্যর্থ হয় তখন এই প্রবাদটির ব্যবহার ঘটে। সাগর পার হতে বানররা উপযুক্ত এটা ভাবার পরও যখন কেউ তা পার হতে এগিয়ে আসে না, তখন মর্কট এই প্রবাদটি উচ্চারণ করে।

রাবণের কাছে অপমানিত হয়ে বিভীষণ রামের শিবিরে চলে এলে প্রথমে সবাই বিভীষণকে দলে নিতে রামকে নিষেধ করে। কিন্তু রাম শরণাগতকে আশ্রয় দেবেন একথা বলার পর আর কেউ রা কাড়তে পারে না। তখন খুদিরাম এর মুখে একটি প্রবাদ উচ্চারিত হয় — ''খুদিরাম।। মরদের বাত হাতির দাঁত সকলেই জানে — লঙ্কাকাণ্ডের মুখবন্ধ হইল এখানে।''[১০৭] এখানে উল্লিখিত প্রবাদটি হল — 'মরদের বাত হাতির দাঁত।'

রাবণ বধ করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। কিন্তু সীতা এতদিন রাবণের গৃহে থাকায় তার সতীত্ব নিয়ে প্রজাদের মধ্যে সন্দেহ তৈরী হয়। একথা জানতে পেরে রামচন্দ্র দুঃখ পান ও হতাশ হন। কিন্তু হনুমান এসকল কথার কোনো গুরুত্ব দিতে চায় না। তাই সে একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে।

''হনু।। হারে ভাই নিন্দুক কিনা বলে শুনতে গলে কি কাজ চলে, কান দিতে নাই লোকের কথায়, সহরে বাজারে লোকে এ দেখি গালি পাড়ে ও কে নিন্দুক ওকে কে ঠেকাতে পারে হায় হায় পাগলে কি না বলে কিনা খায় ছাগলে।''[১০৮]

এখানে উল্লেখিত প্রবাদটি হল — 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।' অনেকে অনেক কথাই বলে থাকে, কিন্তু সকলের কথায় কান দিতে নেই, দিলে জীবনে সমস্যাই বেড়ে চলে। আলোচ্য প্রবাদটির মধ্য দিয়ে হনুমান সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছে।

এইভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায় প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার করেছেন কাহিনীর প্রয়োজনে বারে বারে। যা তাঁর লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগকেই প্রকাশ করে।

—০—

তথ্যসূত্র

১) শকুন্তলা, অবনীন্দ্ররচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৪।

২) তদেব, পৃঃ ২১।

৩) রাজকাহিনী, শিলাদিত্য, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৫৬।

৪) রাজকাহিনী, হাম্বির, তদেব, পৃঃ ১০৭।

৫) রাজকাহিনী, হাম্বিরের রাজ্যলাভ, তদেব, পৃঃ ১২১।

৬) ভূতপত্‌রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৯৯।

৭) তদেব, পৃঃ ২২২।

৮) আলেখ্য, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৬৬।

৯) চৈতন্য চুটকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৯৬।

১০) জেন্ত-সভা বা জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩১৪।

১১) মহামাস তৈল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩৫৫।

১২) আলোর ফুলকি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪।

১৩) তদেব, পৃঃ ৬।

১৪) তদেব, পৃঃ ৮।

১৫) তদেব, পৃঃ ১৩।

১৬) তদেব, পৃঃ ২৫।

১৭) তদেব, পৃঃ ২৭-২৮।

১৮) তদেব, পৃঃ ৪৫।

১৯) তদেব, পৃঃ ৪৬।

২০) তদেব, পৃঃ ৭০।

২১) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৪১।

২২) তদেব, পৃঃ ২০৯।

২৩) তদেব, পৃঃ ২১০।

২৪) তদেব, পৃঃ ২৩২।

২৫) তদেব, পৃঃ ২৩৩।

২৬) তদেব, পৃঃ ২৫৫।

২৭) বাদশাহী গল্প, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩১৩।

২৮) তদেব, পৃঃ ৩১৮।

২৯) তদেব, পৃঃ ৩১৯।

৩০) কানাকাটা রাজার দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩৪৬।

৩১) যাত্রার ফর্দ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩৬৩।

৩২) সিকস্তি পয়স্তি কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩৯০।

৩৩) হেতি হোতির বৃত্তান্ত, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪১৫।

৩৪) বহিত্র, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৩০।

৩৫) কলা বনের কলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৪৬।

৩৬) গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৫৩।

৩৭) উপরামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৮০।

৩৮) তদেব, পৃঃ ৪৮৫।

৩৯) পথে বিপথে, টুপি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭১, পৃঃ ৩৪।

৪০) পথে বিপথে, ইন্দু, তদেব, পৃঃ ৫৮।

৪১) পথে বিপথে, ছাইভস্ম, তদেব, পৃঃ ৭২।

৪২) পথে বিপথে, ছাইভস্ম, তদেব, পৃঃ ৭২।

৪৩) মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৩০।

৪৪) তদেব, পৃঃ ১৩০।

৪৫) তদেব, পৃঃ ১৩৪।

৪৬) কোটরা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৯৪।

৪৭) মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১৯।

৪৮) তদেব, পৃঃ ২২।

৪৯) তদেব, পৃঃ ৩৫।

৫০) তদেব, পৃঃ ৪৮।

৫১) তদেব, পৃঃ ৫৬।

৫২) তদেব, পৃঃ ৬০।

৫৩) তদেব, পৃঃ ৭৪।

৫৪) তদেব, পৃঃ ৮৩।

৫৫) তদেব, পৃঃ ৯৬।

৫৬) চাঁইবুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১০১।

৫৭) তদেব, পৃঃ ১০৪-১০৫।

৫৮) তদেব, পৃঃ ১১৬।

৫৯) তদেব, পৃঃ ১২৯।

৬০) তদেব, পৃঃ ১৩০।

৬১) তদেব, পৃঃ ১৪১।

৬২) তদেব, পৃঃ ১৪৫।

৬৩) তদেব, পৃঃ ১৬৪।

৬৪) তদেব, পৃঃ ১৬৬।

৬৫) তদেব, পৃঃ ১৭৪।

৬৬) তদেব, পৃঃ ১৮২।

৬৭) মহাবীরের পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২৪৮।

৬৮) তদেব, পৃঃ ২৫৩।

৬৯) শিব-সদাগর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২৯৩।

৭০) রং-বেরং, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩০৮।

৭১) নোয়ার কিস্তি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩৩৬।

৭২) রাসধারী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৩৬৯।

৭৩) উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৯।

৭৪) তদেব, পৃঃ ২০।

৭৫) কঞ্জুষের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৭৩।

৭৬) গজ-কচ্ছপের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৭৪।

৭৭) লম্বকর্ণ পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৪৭।

৭৮) তদেব, পৃঃ ১৪৭।

৭৯) হংসনামা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৭৬।

৮০) তদেব, পৃঃ ১৮২।

৮১) এস্‌পার ওস্‌পার, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২২১।

৮২) জাবালির পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২৫৭।

৮৩) তদেব, পৃঃ ২৬২।

৮৪) দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২৮০।

৮৫) যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ৪।

৮৬) তদেব, পৃঃ ৬।

৮৭) তদেব, পৃঃ ৪৭।

৮৮) তদেব, পৃঃ ৫০।

৮৯) তদেব, পৃঃ ১০৩।

৯০) তদেব, পৃঃ ১২৫।

৯১) তদেব, পৃঃ ১৮৯।

৯২) তদেব, পৃঃ ২৩০।

৯৩) তদেব, পৃঃ ২৫৭।

৯৪) তদেব, পৃঃ ৩১০।

৯৫) তদেব, পৃঃ ৩১৫।

৯৬) বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, জাতি ও শিল্প, অবনীন্দ্র রচানাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ১৮৫।

৯৭) বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, সন্ধ্যার উৎসব, তদেব, পৃঃ ৩২৩।

৯৮) বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, খেলার পুতুল, তদেব, পৃঃ ৩২৫।

৯৯) ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ১৯৮।

১০০) কালোর আলো, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ২৯১।

১০১) রস ও নীরস, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৩৪০।

১০২) নতুনে পুরাতনে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৪৪২।

১০৩) তদেব, পৃঃ ৪৪৩।

১০৪) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, খুদ্দুর যাত্রা, প্রতিক্ষণ, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃঃ ৬৩।

১০৫) তদেব, পৃঃ ৭৯।

১০৬) তদেব, পৃঃ ১০০।

১০৭) তদেব, পৃঃ ১১৭।

১০৮) তদেব, পৃঃ ২৬৯।

—০—

ডাক ও খনার বচন

প্রবাদ-প্রবচনের মতোই ডাক ও খনার বচন এর ব্যবহার লোকসমাজের মানুষ করে থাকে। জল-আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলি ডাকের বচন এবং কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয়গুলি সাধারণত খনার বচন নামে পরিচিত। লোকসামাজের মানুষজন কৃষিকাজে এই খনার বচনগুলির নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে চলে। আসলে এই বচনগুলি যে লোকসমাজের মানুষের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ফল, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। ডঃ সেখ মকবুল ইসলাম এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন —

''সাধারণভাবে জ্ঞানী ব্যক্তির বচনকে ডাকের বচন বলা হয়। অন্যমতে ডাক হল বৌদ্ধতান্ত্রিক পুরুষ। অসমের কামরূপ জেলার বিউসী পরগনার লৌহ (লোহিডাঙ্গরা) গ্রামে তার জন্ম। ডাকের বচনের মূলে রয়েছে বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ডাকার্ণব' - একথাও মনে করা হয়। খনা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রচলিত সে সিংহল রাজকন্যা। খনা মিহিরের স্ত্রী। এছাড়া '২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত মহাকুমার দেউলী গ্রামে খনার নিবাস ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।' খনা বিষয়ক আলোচনা কালে ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, — ''খনা শব্দটির মূলে আছে 'ক্ষণ'; Particular time কৃষি, আবহাওয়া, গণনা সব কিছুর মূলেই আছে 'ক্ষণ'। খনার বচনের সঙ্গে এই 'বিশেষ সময়ে'র এই যোগ অন্যতম প্রধান বিষয়। খনার আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টিও বিবেচ্য বলে মনে কার যেতে পারে।''[১]

অবনীন্দ্রনাথ 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' তে দুটি খনার বচন ব্যবহার করেছেন। লঙ্কায় অনাবৃষ্টির কারণ ইন্দ্রদেব কিনা তা মহোদরের কাছে রাবণ জানতে চাইলে মহোদর ইন্দ্রের এত সাহসনেই বলে রাবণকে জানায়। তাই এই অনাবৃষ্টির কারণ জনার জন্য সে খনা গণৎকারকে ডাক দিয়ে গণিয়ে নেওয়ার কথা বলে —

''রাবণের আজ্ঞায় খনা এসে বাঁশের চোঙার মধ্য দিয়ে আকাশে দৃষ্টি করে দিয়ে বললে —

'রোহিণীতে শনির দৃষ্টি
সে কারণে হয় না বৃষ্টি।'

'কে সে শনি, কে বা রোহিণী? বলে মহোদরের দিকে রাবণ চাইতেই মহোদর বলছেন — 'আজ্ঞে শনি একটি গ্রহ, আর রোহিণী হচ্ছেন ওর নাম কি একটি চন্দ্রমহিষী।' ''[২]

রোহিনীর উপর শনির দৃষ্টিপাতের কারণেই যে বৃষ্টি হচ্ছে না খনা তা গণনা করে বলে। এরপর মহোদর রোহিণীর উপর শনির দৃষ্টি কতক্ষণে কাটবে তা জানতে চাইলে খনা জানায় — ''খনা খড়ি পেতে দেখে বললেন —

'পাঁচশনিতে মেঘের আঁচ
পুকুর ভেসে পালায় মাছ।'

পাঁচ গণ্ডা কড়ি গণৎকারকে দিয়ে মহোদর শনিদমনে অগ্রসর হলেন।''[৩]

অবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের 'অসুন্দর' প্রবন্ধে অসুন্দর ও সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে ঊষার বর্ণনায় একটি খনার বচনের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন — ''এইবার একটি সুন্দর বচন শোনাই —

'ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা
উনিয়ে বসে খাবে করি আশা
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা
খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা।'

ঊষার সহজ সুন্দর বর্ণনা, এর মধ্যে কতটা সত্য কতটা মঙ্গল এসব মাপতে গেলে এর রসভঙ্গ হয়। বেদেও ঊষার বর্ণনা আছে, সে আর এক ভাবের সুন্দর। অথচ এই খনার বচনের মধ্যে যেমন ঊষা কতক সত্য ঘটনা ধরে বর্ণনা করান হল ঠিক তেমন ভাবে ঋষিরা ঊষার বর্ণনা করলেন না, সেখানে সত্য ও কল্পনা মিলে-মিশে সুন্দর হয়ে দেখা দিলে। ...''[৪]

আবার রামায়ণের কাহিনী নিয়ে তিনি 'খুদ্দুর যাত্রা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই রচনায় হনুমানের সংলাপে একটি খনার বচন ব্যবহৃত হয়েছে —

''।। হনু।। মঙ্গলে ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা যা।''[৫]

অর্থাৎ মঙ্গলবারের রাত্রি শেষে বুধবার সকালে কোথাও যাত্রা করলে কাজে সফলতা পাওয়া যায়। এমন ধরনের বিশ্বাস লোকসমাজের মানুষ লালন করে থাকে।

—০—

তথ্যসূত্র

১) চক্রবর্তী বরুণকুমার (সম্পাদনা), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জুলাই ১৯৯৫, পৃঃ ২১২-২১৩।

২) চাঁইবুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১৭৮।

৩) তদেব, পৃঃ ১৭৯।

৪) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী / অসুন্দর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ১৭৮।

৫) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, খুদ্দুর যাত্রা, প্রতিক্ষণ, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃঃ ১৬২।

—০—

ছড়া

লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপাদান ছড়া। এই ছড়া সংগ্রহের কাজে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন। গ্রামীণ সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করে তিনি সমাজের মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন, এর মহামূল্যবানতা বোঝানোর জন্য। এই ছড়া সংগ্রহের কাজে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও সমানভাবে উৎসাহিত করেন। ''অবন, তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল, বেশ লাগছে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাতাঞ্চির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া জোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করছি। তোমাদের বুড়ি দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভুলো না। — রবিকাকা''[১]

যার ফলস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথও এই কাজে ব্রতী হয়ে পড়েন। ছড়া সংগ্রহের পাশাপাশি তিনি এই নিয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন, যা 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে প্রকাশিত হয়।

যেখানে তিনি ছড়ার নানা দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। আসলে ছোটোবেলা থেকেই অবনীন্দ্রনাথ দাস-দাসীদের কাছ থেকে রূপকথা, ছড়া শুনে বড়ো হয়েছেন। পদ্মদাসী ছড়া কেটে যখন তাঁকে ঘুম পাড়াত ছোটো অবনের মন এক অন্য জগতে পাড়ি দিত। এই সমস্ত কিছুই তার মধ্যে লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয়। যার ফলস্বরূপ আমরা তাঁর সাহিত্যে লৌকিক ছড়ার ব্যবহার দেখতে পাই। বিভিন্ন প্রবেন্ধ তিনি যেমন ছড়ার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনি তাঁর নানা রচনায় লোকিক ছড়ার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কাহিনীর প্রয়োজনে। তবে তাঁর এই ছড়ার ব্যবহারেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কখনো তিনি লৌকিক ছড়াকে অপরিবর্তিত রেখে ব্যবহার করেছেন, কোথাও ছড়ার কিছুটা পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো চরিত্রের কথোপকথনে বা গানে ছড়ার ব্যবহার করেছেন।

ক্ষীরের পুতুল ঃ

এই রচনায় লেখক লৌকিক ছড়ার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ষষ্ঠীতলায় ষষ্ঠীঠাকুরের কাছ থেকে দিব্যচক্ষু পেয়ে বানরের চোখে যে একের পর এক ছবি ভেসে উঠেছিল তা অভিনব। আর সেখানেই এসেছে একাধিক লৌকিক ছড়ার গদ্য বর্ণনা। বানর দেখল — ''... ষষ্ঠীতলায় ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে — ... সেখানে আছে দিঘির কালো জল, তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ তার পরে আম-কাঁঠালের বাগান, ... আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তী গাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাছে চলে বেড়াচ্ছে, ... ছেলেরা সেই নীল ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে

ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলাপুলির দেশে পটুরানীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। ... সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে! সে এক নতুন দেশ — সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্‌চিক্ জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, ... এমন সময় টাপুর-টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল, অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন পাড়ায় কোন্ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে - এক কন্যে রাঁধলেন বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তার সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলে ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দুপাশে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়ারে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন — ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।''[২]

এখানে অবনীন্দ্রনাথ ষষ্ঠীতলার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে যে সমস্ত লৌকিক ছড়ার টুকরো টুকরো অংশ ব্যবহার করলেন তা আমরা তুলে ধরতে পারি —

ক) মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর,
কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটি ধর।

খ) ডালিম গাছে পরভু নাচে
তাক ধুম ধুম বাদ্যি বাজে।

গ) ওপারে জন্তি গাছটি জন্তি বড়ো ফলে,
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।

ঘ) আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি,
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।

ঙ) খোকামনির বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে
তারা হিরেয় দাঁত ঘষে।

চ) আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই,
মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ'পন কড়ি, গুনতে গুনতে যাই।

ছ) বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।

জ) খোকা গেল মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কুলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে
মাছ নিয়ে গেল চিলে।

ঝ) খোকা এল বেড়িয়ে
দুধ দাও গো জুড়িয়ে
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হলেন ক্ষ্যাপ্ত।

ঞ) এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারি মাছে বসে আছে শিব সদাগর।

ট) আয়রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে।
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদর নাচে।
ওরে ভোঁদর ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

ভূতপত্‌রীর দেশ ঃ

এই রচনাটি শুরুই হয়েছে একটি প্রচলিত ছড়া দিয়ে —

''মাসি-পিসি বনগাঁ-বাসী বনের ধারে ঘর
কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।''[৩]

এরপর পুরো রচনা জুড়ে তিনি কথক ও অন্যান্য চরিত্রের মুখ দিয়ে অনেক লৌকিক ছড়ার ব্যবহার করেছেন। আখ্যানের কথক পাল্কিতে চড়ে মাসির বাড়ি থেকে পিসির বাড়ি চলেছেন — এই হচ্ছে মূল ঘটনা। এরই সঙ্গে এসেছে নানান কাহিনী। আখ্যানের 'কিচ্‌কিন্দের' কথা অংশে এসেছে একাধিক ছড়ার ব্যবহার। সেখানে গোবিন্দের মা ভোঁদড়-ছানাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে ছড়া কাটে —

''ধেই-ধেই চাঁদের নাচন।
বেলা গেল চাঁদ নাচবি কখন।''[৪]

এরপরে হারুন্দের মুখ দিয়ে একটি খেলার ছড়া উচ্চারিত হয় —

''ইকড়ি-মিকড়ি-চামচিকড়ি
চাম্ কৌটো মজুন্দার
ধেয়ে এলো দামুদার।
দামুদার ছুতারের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।''[৫]

প্রচলিত এই খেলার ছড়াটির তিনি কিছু কিছু শব্দের বানানের পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছেন। আমরা এখানে অনুরূপ একটি ছড়ার উল্লেখ করতে পারি —

''ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি চাম কোটে মজুমদার,
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো,
হিঙ্গুল গাছে বেঁধে থো।'[৬]

আবার ইকড়ি মিকড়ির দল হিংচে গাছের চারিদিকে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ছড়া কাটে —

''চাঁদ-চাঁদ-চাঁদ গগন চাঁদ
হিংচে বনে শশী!
ওই এক চাঁদ এই এক চাঁদ
চাঁদে মেশামেশি।'[৭]

এটি একটি ছেলে ভুলানো ছড়া। আবার হুতুম প্যাঁচার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে খেলার ছড়া —

একটি কথা। — কী কথা?

ব্যাঙের মাথা। — কী ব্যাঙ?

সরু ব্যাঙ। — কী সরু?

বামুন গরু। — কী বামুন?

ভাট বামুন। — কী ভাট?

গো ভাট। — কী গো?

চিতি গো। — কী চিতি?

সোনা চিতি। — কী সোনা?

গিনি সোনা। — কী গিনি?

মানুষের গিনি। — কী মানুষ?

বনমানুষ। — কী বন?

খেজুর বন। — কী খেজুর?

ঠিক মজুর। — কী ঠিক?

বেঠিক।''[৮]

ক্রমে ক্রমে প্যাঁচা কথককে গল্প শুনিয়ে চলে —

''এক যে ছিল শেয়াল,

তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল।

তার বাপের নাম রতা,

ফুরোল আমার কথা।।''[৯]

এটিও একটি ছেলে ভুলানো ছড়া। এর সঙ্গে তুলনীয় একটি ছড়া হল —

''এক যে শেয়াল

তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল।

তার বাপের নাম রতা

ফুরুল আমার রাত দুপুরের কথা।''[১০]

তারপর প্যাঁচা কথককে ব্যাঙের গল্প বলে চলে —

'তাঁতি ঘরে ব্যাঙর বাসা, তিনটে পেড়েছে ছানা।

খায় দায় নিদ্রা যায়, তাঁত ঘরে তার থানা।।

সুবুদ্ধি তাঁতির ব্যাটা কুবুদ্ধি ধরিল।
তার একটি ছানার পায়ে চেপে গেল।।
আর একটি ব্যাঙ ছিল বড়ই সিয়ানা।
লিখন পাঠায়ে দিল পরগনা-পরগনা।।
আজিপুর গাজিপুর মধুপুর ডাঙা।
লক্ষ ব্যাঙ এল তথা চক্ষু করে রাঙা।।
সুতোনাতা নিয়ে তাঁতি যাচ্ছে রাজার হাট।
লক্ষ ব্যাঙে তাড়াতাড়ি আগুলিল ঘাট।।
তরাসে মরাসে তাঁতি গাছেতে উঠিল।
কোথা ছিল কোলা ব্যাঙ মুখে লাথি মেল।।
মেরো না ধর না, ভাই তাঁতিরে গোঁসাই।''[১১]

উল্লিখিত ছড়াটি একটি ছেলে ভুলানো ছড়া। এর সঙ্গে তুলনীয় একটি ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে, যা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমনির ছড়া' বইতে মেলে —

'তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা
কোলা ব্যাঙের ছাঁ,
খায় দায় গান গায়
তাই রে না রে না।
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল,
আঁকড়া বাড়ি নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছা মারিল।
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ বড়ই সেয়ানা;
লিখন পাঠায়ে দিল পরগনা পরগনা
আজি ডাঙ্গা কাজি ডাঙ্গা মধ্যে ধনেখালি
সেখান থেকে এল ব্যাঙ চোদ্দ হাজার ঢালি।
হুগলির বাইরে ভাই ব্যাঙের অভাব নাই,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ আগুলিল পথে।
সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি উঠল গিয়ে ডালে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি নামল গিয়ে ভুয়ে,

একটা ছিল কোলা ব্যাঙ মারল লাথি মুয়ে।
ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি,
চোদ্দহাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাঁই-ফাঁই,
না মার না মার মোর তাঁতিরে গোঁসাই।''[১২]

শেয়ালের মুখে উচ্চারিত ছড়া —

'বাপ ভনরি!
কি খাইতে সাধ করেছে? — চালদা মসুরি?
বাপ নন্দলাল!
খি খাইতে সাধ করেছ? — পাকা তাল?''[১৩]

এরপর শেয়াল কথককে আবার ছেলে ভুলানো ছড়া বলে চলে —

''এক যে আছে একা নোড়ে,
সে থাকে তাল গাছে চড়ে।
দাঁত দুটো তার মূলোর মতো,
পিঠখানা তার কুলোর মতো।
কান দুটো তার নোটা-নোটা,
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা!
কোমরে বিচুলি দড়ি
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি।
তাল খেতে যে কাঁদে —
তারে ঝুলির ভেতর বাঁধে।
গাছের ওপর চড়ে
আর তুলে আছাড় মারে!''[১৪]

এছাড়াও এই রচনায় আরো যে সমস্ত লৌকিক ছড়ার উল্লেখ রয়েছে তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হল —

ক) 'তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই।'[১৫]

খ) 'ও হনুমান, কলা খাবি?
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?'[১৬]

গ) 'আদুরের কলাগুলি বাদুড়ে খায়,
ধর ধর খোকামনি মামার বাড়ি যায়।'[১৭]

এই ছড়াটির সঙ্গে একটি তুলনীয় ছড়া হল —

'আদুরের কলা ছড়া বাদুড়ে খায়
তালতলা দে খোকনমনি বিয়ে করতে যায়।'[১৮]

খ) 'গুরু মশাই গুরু মশাই
তোমার পোড়ো হাজির।
চড় চড়িয়ে পড়ুকবেত
হোক বিচার কাজির।'[১৯]

এই ছেলে ভুলানো ছড়াটি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমনির ছড়া' বইতে একটু ভিন্ন রূপে পাওয়া যায় —

'গুরু মশাই গুরু মশাই তোমার পোড়োর বে
পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচতে লেগেছে।
গুরু মশাই গুরু মশাই তোমার পোড়ো হাজির
এক দণ্ড সবুর করো জল খেয়ে আসি।'[২০]

ঙ) মাছরাঙাও এখানে গুরু ভূমিকা নেয় —

'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে
মৎস ধরিবে খাইবে সুখে।'[২১]

চ) 'অবু তবু গিরি সুতা।
মায়ে বলে পড় পুতা।।
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
না পড়লে ঠ্যাঙার গুঁতি।'[২২]

এই ভাবে দেখা যায় 'ভুতপত্রীর দেশ' এর কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক ছড়ার বহুল ব্যবহার। যা অবনীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য প্রীতিকেই দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

খাতাঞ্চির খাতা ঃ

অবনীন্দ্রনাথ এর 'খাতাঞ্চির খাতা' রচনাতেও লৌকিক ছড়ার ব্যবহার চোখে পড়ে। কখনো

চরিত্রের কথোপকথনে, আবার কখনো এসেছে ছড়ার গদ্য বর্ণনা। খাতাঞ্চি, সোনাতোন, সোনা, আঙুটি, পাঙুটি সকল চরিত্র যেনো ছড়া কেটে কথা বলে। খাতাঞ্চির চাকর সোনাতোন তেল কেনার জন্য এক পয়সা চাইলে, খাতাঞ্চি তার ছড়া কেটে হিসেব চায় — 'এক পয়সার তৈল, / কিসে খরচ হৈল?'[২৩]

আর সোনাতোনও ছড়া কেটেই তার উত্তর জানান দেয় — 'এক পয়সার তৈল খরচ আর কিসে হৈল, খরচ হৈল কর্তার দাড়িতে, গিন্নির পায় আর দিয়েছি মেয়ের গায়।'[২৪]

এর উত্তরে রেগে গিয়ে খাতাঞ্চি বলে — 'বেটা হতভাগা ঘরে এল, বাকি তেলটা ঢেলে নিল।'[২৫]

এভাবে অবনীন্দ্রনাথ খাতাঞ্চি ও সোনাতনের কথোপকথনে ছড়াকে গদ্যরূপে ব্যবহার করলেন। এই ছড়াটির সঙ্গে তুলনীয় একটি ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে —

'এক পয়সার তৈল
কিসে খরচ হৈল?
তোর দাড়ি মোর পায়
আরো দিচ্ছি ছেলের গায়
ছেলেরে মেয়ের বিয়ে গেছে
সাত রাত গান হয়েছে
কোন অভাগি ঘরে এল
বাকি তেলটা ঢেলে নিল।'[২৬]

সোনার মা সোনাকে যখন ঘুম পাড়ায় তখন প্রায় ছড়া কাটত। সোনার মা বলত —

'সোনা যাবে শ্বশুর বাড়ি, সঙ্গে যাবে কে,
বাড়িতে আছে পুসি বেড়াল, কোমর বেঁধেছে।'[২৭]

এর সাথে তুলনায় একটি ছড়া হল —

'খুকু যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
বাড়িতে আছে হুলো বেড়াল কোমার বেঁধেছে?[২৮]

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যবহৃত ছড়াতে 'খুকু'র স্থানে সোনা এবং 'হুলো'-র স্থানে পুসি শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত অনেক ছড়াতেই কাহিনীর প্রয়োজনে এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে তাদের মায়েরা ছড়ার সুরে আশ্রয় নেয়। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

''... কিন্তু তারা কচি ছেলে কিনা তাই যেমন মা সুর করে তাদের চাপড়ান, 'খুকু ঘুমোল পাড়া জুড়োল' বলেন, অমনি তারা ঘুমিয়ে পড়ে। কোনো কোনা ছেলে, 'বর্গি এল দেশে' একটুও শুনতে পায়, তারপর বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেল তাও দেখে, কিন্তু তারপর যে কী কাণ্ড ঘটে খুব কম ছেলেই সেটা দেখেছে।''[২৯]

আসলে ছোটো ছেলেদের কাছে ছড়ার অর্থের কোনো গুরুত্ব থাকে না, তারা ছড়ার ধ্বনি ঝঙ্কার ও সুরেই মোহিত হয়ে পড়ে — অবনীন্দ্রনাথ একথাই বলতে চেয়েছেন। এখানে যে ছড়াটির তিনি ব্যবহার করেছেন তা হল —

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

ছেলে মেয়েদের মনের মধ্যে যে লুকোনো সবুজ খাতা থাকে, তা অনেক ছেলে মেয়েই বুড়ো হয়ে গেলেও তার হদিস পায় না। আসলে নিজের মনের মধ্যে কল্পনার যে রাজ্য রয়েছে, তা অনেকে আবিষ্কার করতে পারে না। এই সবুজ খাতার বর্ণনা দিতে গিয় অবনীন্দ্রনাথ ছড়ার মধ্য দিয়ে ছবি এঁকেছেন গদ্যের অন্বয়ে। সেই খাতার — ''প্রথম পাতাতেই লেখা কমলাপুলির দেশে সকাল হচ্ছে, আকাশে কললালেবুর রঙ, গাছে গাছে সোনালি সব ফল-ফুল-পাখি, তার মাঝে কনকরাজার মেয়ে কপলে গাই দুইতে বসেছে, ... খেলাঘরে ছেলেরা ইকড়ি-মিকড়ি খেলছে, হিঙুল গাছে মাদারের ফুল, আঁকড় ফুল বেঁচ ফুল ফুটে রয়েছে, ট্যাঁপার ভিতর সব ঝিঙে ঝুলছে, নটেশাগের গুঁড়িতে নেজঝোলা পাখি উড়ে বসে চাটিম কলা খাচ্ছে, চালতাতলায় ঝিঁঝি ডাকছে আর পাখনা বিবি নাচছেন, সোনার আঁচিলে-পাঁচিলে হড়মবিবি খড়ম পায়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আর হলদেগুড়ির মাঠে গামুর-গুমুর ঢোল বাজছে, চেঙা ক্ষেতে নৈছাগল ঝেঙা ফুল ছিঁড়ে খাচ্ছে, বনকাপাশি গাছে নোটন পায়রা ডিমে তা দিচ্ছে, রামছাগল আতাপাতা খেতে লেগেছে, মুড়ো নটেগাছের তলায় গাল ফোলা গোবিন্দের মা বসে বসে তাই দেখছে, আর চুবড়ি মাথায় দিয়ে ভোম্বল দাস হাটে চলেছে। তারপর বাপ-মায়ের দেশের ছবি — সেখানে পুকুরে পানকৌড়ি ডুব দিয়ে মাছ ধরছে, বাঁশতলায় বুড়ি শুকনো পাতা ঝাঁট দিচ্ছে, জোড় পুতুলের বিয়ে হচ্ছে, কাঁচনী পাড়ার নাচনী নাচ্ছে, জটাধারী ভিক্ষে চাইছে, 'হাতে পো কাঁখে পো' ছেলে ধরে বেড়াচ্ছে, জোয়ান গুরু জোড়া-বেত হাতে বসে, গোয়ালের শোভা নেহাল বাছুর হামা দিচ্ছে, শিবসদাগর অগ্রদ্বীপে বাণিজ্য করতে চলেছেন, ভাঁত-কাঁদুনে কেউয়ার মা ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছে, আর মাসি পিসি বনগাঁয়ে বসে খয়ের মোয়া পাকাচ্ছেন। ... আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সূর্য্যি

পাটে বসলেন; খুকু জল আনতে পদ্মদিঘির ঘাটে চলল, সেখানে পদ্মদিঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল ফুটেছে। খুকুর গোছাভরা চুল বাতাসে হোটোর নিচে দুলছে, মা দূর থেকে ডাকছেন ঃ

'বৃষ্টি এল ভিজবে সোনা, চুল শুকোনো ভার,
জল আনতে খুকুমনি যেও নাকো আর।'

তারপর একটি ছবি সে যে কী চমৎকার কী বলব। ছোটো নাতনী তার বুড়ো দাদামশায়ের গলা ধরে বাপের বাড়ি যেতে বলছে —

'ওপারেতে কালো রঙ
বৃষ্টি পড়ে ঝম-ঝম
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে,
ওগো দাদাভাই আমার মন কেমন করে।'

দাদাভাই তার পিঠে হাত বুলিয়ে কইছেন —

'এ মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে কঁকিয়ে
ও মাসেতে লয়ে যাব পাল্‌কি সাজিয়ে।'

আর বলছে তারপর দুজনে দুজনের গলা ধরে কাঁদছে —

'হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি
আয় রে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।'

এমন সব ছবি যা দেখে হাসি চাপা যায় না, আবার এমন সব ছবি যা দেখতে দেখতে চোখে চল আসে।''[৩০]

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ আলোচ্য অংশে টুকরো টুকরো ছড়ার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক অপরূপ চিত্র ফুটিয়ে তুললেন। একটি ছড়ার পর আর একটি ছড়ার ব্যবহার বেমানান লাগল না। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে ছড়াগুলোর খণ্ডাংশ মিলে এক অখণ্ড চিত্র তুলে ধরল। এখানে যে সমস্ত ছড়াগুলির ব্যবহার হয়েছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল —

ক) ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।

খ) হরম বিবির খড়ম পায়,
লাল বিবির জুতো পায়।

গ) ঢোল বাজে গামুর গুমুর
সানাই বাজে রইয়া —

ঘ) মাসিপিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।

ঙ) গোয়ালের শোভা নেয়াল বাছুর।
গগনের শোভা চাঁদ।

চ) আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সূর্যি গেল পাটে।
খুকু গেছে জল আনতে
পদ্মদিঘির ঘাটে।
পদ্মদিঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল,
হেঁটোর নিচে দুলছে খুকুর
গোছা ভরা চুল।

ছ) 'ওপারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পরে ঝম্ ঝম্
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।'
'এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে কঁকিয়ে
ওমাসেতে নিয়ে যাব পাল্‌কি সাজিয়ে।'
'হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।' ''[৩১]

অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই ছড়াটিকে একটু পরিবর্তন করে নিয়ে উপরোক্ত অংশে ব্যবহার করেছেন।

সোনার মা সোনার খাতায় 'পুতু' লেখা রয়েছে দেখে 'পুতু' কে সোনাকে জিজ্ঞাসা করলে সোনা জানায় সে তো পুতুই। কিন্তু পুতু যে কে তা সোনার মা বুঝতে পারে না। আসলে পুতু হল সোনার মনের খাতায় ধরা পড়া এক ছবি। তাই সোনার মার পুতুকে না জানাই স্বাভাবিক। তবে

ছোটোবেলায় ঠানদিদি তাকে যে ছড়া বলত সেখানে এমনই এক 'পুতের' কথা সে শুনেছিল — 'ভূত আমার পুত, শাঁখিনী আমার ঝি।'[৩২]

সম্পূর্ণ ছড়াটি হল —

'ভূত আমার পুত
শাঁখিনী আমার ঝি
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে —
ভয়টা আমার কী?'[৩৩]

বাদশাহী গল্প ঃ

এই গল্পে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নাতি বাদশাকে গল্প বলে চলেছেন। তার সাথে সাথে এসেছে আরো নানা চরিত্র। এখানের চরিত্রগুলিও যেন ছড়া কেটে কথা বলে। কাবুলিদিদি দাদাভাই এর কাছে পুতুল নিয়ে জানাতে গিয়ে ছড়া কাটে — 'দাদাভাই চাল ভাজা খায় ময়না মাছের মুড়ো।'[৩৪]

এই ছড়াটির আমরা পূর্ণরূপটি তুলে ধরতে পারি। যেখানে 'ময়না'-র জায়গায় 'নয়না' শব্দটি এসেছে। ছড়াটি নিম্নরূপ —

''দাদাভাই চাল ভাজা খাই
নয়না মাছের মুড়ো
হাজার টাকার বউ এনেছি
খাঁদা নাকের চুড়ো।
খাঁদা হোক বোঁচা হোক
ঝাপটা কাটা মুখনাড়াটা
ওই জ্বালাতে মরি।''[৩৫]

অবনীন্দ্রনাথের 'চাঁদনি' গল্পে একটি বহু প্রচলিত ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চাঁদনির মা চাঁদনিকে ছাদে নিয়ে চাঁদ দেখিয়ে ছড়া কেটে চলত —

'চাঁদ কোথা পাব বাছা জাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তুই চাঁদের শিরোমণি,
ঘুমোরে খুকুমনি।'[৩৬]

আর মা এর মুখ থেকে ছড়া শুনতে শুনতে চাঁদনি মায়ের কোলে ঘুমে ঢলে পড়ত। এই ছড়াটির অনুরূপ একটি ছড়া উল্লেখ করা যেতে পারে —

'চাঁদ কোথা পাব-বাছ, জাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব —
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব।
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমোরে আমার খোকামণি।'[৩৭]

দেখা যাচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ নিম্নে উল্লেখিত ছড়াটির থেকে দু-একটি শব্দ পরিবর্তন করে বা ছড়ার কিছু অংশ বাদ দিয়ে ব্যবহার করেছেন। আসলে এই গ্রহণ ও বর্জনের খেলা তাঁর সাহিত্যে প্রায়শই চোখে পড়ে।

'মারুতির পুঁথি' তে হনুমানের মুখ দিয়ে একটি ছড়া কিছু পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে। হনুমান বলে —

'দাদা ভাই, চাল ভাজা খাই
করি রামানাম।'[৩৮]

এই ছড়াটির প্রথম দু-ছত্র এরূপ —

দাদভাই চাল ভাজা খাই
নয়না মাছের মুড়ো।

'শিব-সদাগর' নাটকে শিব এর মুখে বলতে শোনা যায় — 'ধরো গান, ছাড়ো জাহাজ, বাজাও টুমটুমি — বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।'[৩৯] তিনি এই অংশে ছড়ার একটি খণ্ডাংশ ব্যবহার করলেন।

অবনীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ' থেকে কাহিনী নিয়ে 'যাত্রাগাণে রামায়ণ' নামে এক যাত্রাপালা লিখেছিলেন। এছাড়াও তিনি অনেক ছোটো ছোটো পালা রচনা করে ছিলেন। যেখানে এসেছে ছড়া, গান ও প্রবাদের ব্যবহার। এখানে তিনি কিছু ছড়াকে পরিবর্তন করে নিয়ে গানের মধ্যে ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো চরিত্রের কথোপকথনে ছড়ার ব্যবহার করেছেন। যেমন — 'উড়নচণ্ডীর পালা'য় 'চামচিকির নৃত্যগীত' এ খেলার ছড়াকে একটু পরিবর্তন করে নিয়ে ব্যবহার করলেন —

'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিক্‌ড়ি চাম ছাত চামের ঘর,
উড়ে পড় দামোদর, পারাছুট খুলে ধর,

উড়ে পড় ঝুলে পড়, উঠে পড় নেমে পড়,
ডুবে পড় ভেসে পড়, ঘুরে পড় সরে পড়,
গান ধর - চিড়িমিড়ি চিড়িমিরি।'[৪০]

অবনীন্দ্রনাথ এখানে যে 'খেলার ছড়া' টিকে ব্যবহার করলেন তার উল্লেখ করা হল —

'ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।'[৪১]

আবার বিকটের গীতেও একটি 'ছেলে ঘুমানো ছড়া'র প্রথম অংশ ব্যবহার করেছেন। প্রথমে আমার গীত-টি তুলব —

'আয় ঘুম্ ঘুম্ যায় ঘুম্ ঘুম ঘুমে দোলা দিয়ে
তালের পাতা ঘুম্ ঘুম্ যায় ঘুমের বাতাস দিয়ে
আস্ ঘুমা ঘুম্ পাশ ঘুমা ঘুম্ ঘুমচি গাছের পাতা
ঘুমার তরুলতা
ঝুমকো লতায় ঝিঁঝিরা ঝিমায়
ঘুঙুর বাজান থামিয়ে
নিথর ঘুমে তলিয়ে।'[৪২]

যে 'ছেলে ঘুমানো ছড়াটি' থেকে উপরোক্ত গানের প্রথম লাইনটি নেওয়া হয়েছে সেটি হল —

'আয় ঘুম ঘুম যায় ঘুম ঘুম
খোকার চোখে আয়।' [৪৩]

'মউর ছালের পালা' তে তোতাপাখি গান গায় —

'আতা গাছের তোতা পাখি
ডালিম গাছের নাজিম বৌ,
কথা কস্ না আজ যে কেউ!'[৪৪]

এখানে যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' টির গীত রূপ দেওয়া হয়েছে, সেটি হল —

'আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মৌ
কথা কওনা কেন বৌ?'[৪৫]

এই পালার নানা স্থানে ছড়ার ব্যবহার করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। কখনো গানে আবার কখনো চরিত্রের কথোপকথনে। আমরা তা নিম্নে তুলে ধরব। বায়সের নৃত্য গীতে —

'হাতের নাচন, পায়ের নাচন
বাটা মুখের নাচন,
ভাঁটা চোখের নাচন,
কাঁটালে ভুরুর নাচন,
চঞ্চু নাকের নাচন,
মাজা বেঙ্কুর নাচন,
আর নাচন কী? —
অনেক সাধন করে নাচ পেয়েছি।'[৪৬]

এখানে যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া'-টিকে একটু পরিবর্তিত করে অবনীন্দ্রনাথ ব্যবহার করলেন, তা হল —

'হাতের নাচন্, পায়ের নাচন্,
বাটা মুখের নাচন্, নাটা চক্ষের নাচন্,
কাঁটালি ভুরুর নাচন্, বাঁশির নাকের নাচন্,
মাজা বেঙ্কুর নাচন্
আর নাচন্ কী?
অনেক সাধন করে জাদু পেয়েছি।'[৪৭]

'বেণুকুঞ্জের পালা'-য় কুরঙ্গের গীতে শোনা যায় —

'এপারেতে কালো রং বারি ঝরে ঝম্ ঝম্
ওপারেতে রাতের তারার আলো ঝিল্‌মিল করে —
কুরঙ্গিনী, হায় আমার মনে কেমন করে —
কেমন কেমন করে মন।'[৪৮]

এই গীতের পাশাপাশি আমরা একটি 'মেয়লি ছড়া'-র উল্লেখ করতে পারি —

'ওপারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্,
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।'[৪৯]

অবনীন্দ্রনাথ যে এই মেয়েলি ছড়াটিকেই একটু পরিবর্তিত করে নিয়ে উপরোক্ত গীতে ব্যবহার করেছেন, তা বোঝা যায়। আসলে তিনি লোকছড়াকে নিজস্ব পংক্তির সঙ্গে ভেঙে চুরে মিশিয়ে নিচ্ছেন কাহিনীর প্রয়োজনে।

তাঁর 'ঋষি যাত্রা' পালায় জাবালির মুখে একটি বহুশ্রুত ছড়ার কয়েক ছত্র উল্লেখিত হয়। সেটি হল —

'কৃষিকর্ম আছে যার, দুর্ভিক্ষ নেই ঘরে তার,
রোগ নেই দেহে যার, নিত্য নিত্য সুখ তার।
মনোমত প্রেয়সী ঘরে,
নিত্য উৎসব সেজন করে।
শাস্ত্র মাস্ত্র ফেলে দাও জলে
লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে,
মৎস্য মারিব খাইব সুখে।'[৫০]

এখানে তিনি নিজস্ব বক্তব্যের সাথে যে ছড়াটিকে যোগ করে দিলেনে সেটি হল —

'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে,
মৎস মারিবে খাইবে সুখে।'[৫১]

'হংসনামা' পালার একাধিক গীতে তিনি ছড়ার ব্যবহার করেছেন, কখনো হুবহু, আবার কখনো কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়ে। যেটা তাঁর রচনার একটি ভঙ্গি বলা যেতে পারে। নারদের গানে শোনা যায় —

'কালিয়া সোনা চাঁদের কোণা
পেয়েছি মনের মতো।
না জানি নদীর কূলে তপ করেছি কত;
কত মুনির তপ, কত কাত্যায়নী জপ,
কত উপোস মাসে মাসে —
কালো সোনা এল দেশে
— সোনামোড়া মিঠে পানের দোনা।'[৫২]

এটি একটি অবনীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়া। সেখানে ছড়াটি খুব সক্ষিপ্ত করে আছে। ছড়াটি হল —

'কালিয়া সোনা চাঁদের কোণা
পেয়েছি মনের মতো,

না জানি নদীর কূলে
তপ করেছি কত!'[৫৪]

এর পরেই মাদল বাজিয়ারা পরপর গান গেয়ে চলে —

'চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের চাঁদ্
হিঞ্চে বনের শশী
এই এক চাঁদ ঐ এক চাঁদ
চাঁদে মেশামেশি।'[৫৪]

এরই অনুরূপ একটি ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে —

'চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ
হিঞ্চে বনে শচী
ঐ এক চাঁদ এই এক চাঁদ
চাঁদে মেশামেশি।'[৫৫]

এছাড়াও তিনি আরও কিছু গানে ছড়াকে ব্যবহার করেছেন। গানটি হল —

'নাই ঘরের তাই খোকা
অন্ধের নড়ি
তিলেক না দেখলে পরে,
বুক ফেটে মরি।'[৫৬]

এই 'ছেলে ভুলানো ছড়া'-র কিছুটা অংশ অবনীন্দ্রনাথ উপরোক্ত গীত অংশে ব্যবহার করেছেন। পূর্ণাঙ্গ ছড়াটি হল —

'নাই ঘরের তাই খোকা অন্ধের নড়ি
তিলমাত্র না দেখিলে বুক ফেটে মরি।
খোকন যখন হাসে মুক্তা যেন ভাসে,
যখন খোকন হাঁটে রক্তে চরণ ফাটে।'[৫৭]

অধিকারীর গানেও এসেছে ছড়ার প্রসঙ্গ। যেমন —

'আয়রে খোকাবাবু আয়
লাল জুতুয়া পায়।
বড়ো বড়ো রায়ের বেটি

উঁকি মেরে চায়।

ওরে খোকা হেঁটে চলে আয়।'[৫৮]

এর সঙ্গে তুলনীয় একটি ছড়ার উল্লেখ করা গেল —

'আমার খোকাবাবু যায়

লাল মোজা পায়

বড়ো বড়ো বাঘের বেটি

উঁকি দিয়ে যায়

খোকা ধীরে চলে যায়।'[৫৯]

এই পালার শেষাংশে অধিকারীরর আর একটি যে গান আছে, তাতেও ছড়ার কথাকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন। গানটি হল —

'I Come, ভাই Come তাড়াতাড়ি,

যদু মাস্টার — বক্সিং ঝাড়ি,

লেগে যাও ঝমাঝম্

মহারণ বেধেছে রসারম্।

জিৎলে হারলে হারলে জিৎলে,

আহা, হাত পা পিছলে আলুর দম।'[৬০]

এখানে যে 'খেলার ছড়া'টির গীতরূপ দেওয়া হয়েছে, সেটি হল —

'আইকম বাইক তাড়াতাড়ি

যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি

রেলকম ঝমাঝম

পা পিছলে আলুর দম।'[৬১]

ছড়াটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়ে ব্যবহারের ফলে হাস্যরসেরই সৃষ্টি হয়েছে।

'বৃক ও মেষ' পালাতে ছাগলের গানে একটি ছড়ার ব্যবহার ঘটেছে। ছাগলের গীত —

'কইতে কইতে আমার কথা

ফুরাবে কি?

রইতে রইতে নটে শাকটা

মুড়াবে কি?

হুড়ুদুম্বার মন্তর এবার

কুলাবে কি?'[৬২]

এই গীতে যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র ব্যবহার হয়েছে তা নিম্নরূপ —

'আমার কথা ফুরোল

নটে গাছটি মুড়োল।'[৬৩]

'জাবালির পালা' তে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' এই বহুশ্রুত ছড়াটিকে ঘৃতাচীর নৃত্যগীতে ব্যবহার করলেন। ঘৃতাচীর নৃত্যগীত —

'কোমল মলয় সমীরে

মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল

কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।

ধীর সমীরে যমুনা তীরে!

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীতে এল বান,

শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে যান,

করেন নাচ গান ধীরে ধীরে।'[৬৪]

ঘৃতাচীর নৃত্যগীত-এ তিনি যে ছড়াটির ব্যবহার করলেন, তা হল —

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।

শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।।

অবনীন্দ্রনাথ 'ঘোড়া-হাটের পালা'য় বালকদলের গানে 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' এই 'খেলার ছড়াটিকে' একটু ভিন্ন রূপে ব্যবহার করেছেন। বালকদলের গীত —

'আগ্‌ডুম বাগডুম ঘোড়াডুম্‌ চলে

ঝাজ মৃদং কাঁসর বলে।

নাচতে নাচতে দিয়ে তুড়ি,

আস্তে আস্তে চলছে ঘুড়ি।

কর্মনাশার পুলটার পার —

লোকের ঠেলায় যাওয়া ভার।

ঘোড়া চমকায় — ঝাঁঝর বাজে,

লাগধুম লাঘধুম্‌ ভরা সাঁঝে।'[৬৫]

এই ছড়াটির অনেক পাঠান্তর পাওয়া যায়। ছড়াটির অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হল —

'আগডুম্ বাগডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলা পুলি।'[৬৬]

এইভাবে আমরা দেখতে পাই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন পালাতে গানের মধ্যে ছড়ার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সেগুলিকে কোনো সময়ই কাহিনীর সাথে বেমানান মনে হয় নি। ছড়ার মধ্য দিয়েই তিনি একের পর এক ছবি এঁকে চললেন।

'রামায়ণ' থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি 'যাত্রাগানে রামায়ণ' নামে একটি বৃহৎ যাত্রাপাল রচনা করেন। এই পালাতেও তিনি গানের মধ্যে ছড়ার প্রয়োগ করেছেন, রচনার শুরুতেই বুড়ি দোহারকিরা গান গায়। আর সেখানেই এসেছে একটি পরিচিত ছড়ার ব্যবহার। বুড়ি দোহারকিদের গান —

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর
তার মধ্যে উইয়ের ঢিবি
বাল্মীক মুনির ঘর
সেই চরে একঘর নিষাদ
বলে আটাকাটি ধর — বনে আঘেটি আছে।'[৬৭]

এখানে তিনি যে ছড়াটি থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে গানে ব্যবহার করলেন তা হল —

'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর।'[৬৮]

এই দুই লাইন নিয়ে তারপর গানের বাকি অংশ তিনি নিজের মতো করে তৈরী করে নিলেন।

ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়ে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় চলে যায়। তখন দেবতাগণ গান শুরু করে —

'ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল
বাতাস লাগল হাড়ে
শিয়েল কটা ডেকে থামলে
বেগুন ক্ষেতের পারে।'[৬৯]

এই গানের অনুষঙ্গ ধরে আমাদের একটি ছড়া স্মরণে আসে —

'ছেলে ঘুমোলো পড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?'[৭০]

রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করলে দোহারগন গান গেয়ে ওঠে —

'আলতা বুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের বে
ধনুকভঙ্গ পণে রাম সীতারে জিতেছে।
ঢোল বাজে গামুর গুমুর সানাই বাজে রইয়া
পরার জুতে নিতে আইছে ঢোলে বাড়ি দিয়া।
রাম এলেন বিয়া করতে মিথিলার দেশে
তারা গাই - বলদে চষে তারা হীরের দাঁত ঘষে।
সীতা চলেন বিয়া করে অযুদ্ধার দেশে
তারা রূপার খাটে পা রাখে সোনার খাটে বসে।'[৭১]

এই গানটি অনেকগুলির ছড়ার সমষ্টি নিয়ে তিনি রচনা করলেন। মাঝে মাঝে সংযোজন করেছেন নিজস্ব কথা। ছড়াগুলি উল্লেখ করা হল —

ক) 'আলতা নুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড়া পুতুলের বিয়ে।
এত টাকা নিলে বাবা, দূরে দিলে বিয়ে।'[৭২]

খ) 'ঢোল বাজে গামুর গুমুর
সানাই বাজে রইয়া —
পরার পুতে নিতে আইছে
ঢোলে বাড়ি দিয়া।'[৭৩]

গ) 'খোকোমনির বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে
তার হিরেয় দাঁত ঘষে।'[৭৪]

রামের অশ্বমেধের ঘোড়া লব-কুশ আটকালে ঘোড়া বলে —

‘লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।
কথাটা কি দুজনার
একেবারে জানা নেই।?’[৭৫]

এখানে ঘোড়ার মুখ দিয়ে যে ছড়াটির ব্যবহার করা হয়েছে তা হল —

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ঃ

অবনীন্দ্রনাথ ‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’ গ্রন্থের কিছু প্রবন্ধে ছেলে ভুলানো ছড়া সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। ছেলে ভুলানো ছড়া শুধুমাত্র যে ছোটো ছেলেদেরই নয়, তার মধ্যে তারুণ্যের দৃষ্টিও রয়েছে, সেকথা তিনি এই গ্রন্থের ‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন —

‘‘ন্যাকামো দিয়ে শিশুর আবোল-তাবোল আধ-ভাঙা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে, অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ক ভাঙাচোরা টানটোন আঁচড়-পোঁচড় চুরি করে বসে-বসে কেবলই শিশু কবিতা, শিশু ছবি লিখে চললেই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তার মন-ভোলানো হয়, এ ভুল যারা করে চলে তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে, কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না, শিশুর বাপ-মাকেও নয়। ছেলে ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলেমানুষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি —

‘ও পারেতে কালো রং, বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌
এ পারেতে লঙ্কা গাছ, রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।’

অজানা কবির গান ছেলেমানুষি মোটেই নয়, এতে ছেলে বুড়ো সবার মন ভুলিয়ে নেয়।. ..’’[৭৬]

অর্থাৎ ছড়া যে শুধুমাত্র শিশু বা বালকের মনকেই আকর্ষণ করে না, যা সমস্ত বয়সের মনকেই আকর্ষ করতে পারে, সেই কথাই তিনি এখানে তুলে ধরলেন।

আবার ‘শিল্প বৃত্তি’ প্রবন্ধে তিনি শিল্পের উৎপত্তির পেছনে মানুষের প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবৃত্তির বশে মানুষ যা সৃষ্টি করে, তাই সার্থক শিল্পের রূপ পায়। তাঁর মতে শিল্পের প্রথম অবস্থায় ছিল রং ও রেখার প্রাধান্য। পল্লী শিল্পগুলোর মধ্যে তিনি বর্ণ ও রেখার উপর মানুষের ঝোঁক লক্ষ্য করেছিলেন। আর্টের এই শৈশবাস্থায় মানুষ তার হাতে তৈরি সমস্ত কিছুর উপরেই রেখার

সরলতা ও রঙের প্রাচুর্য ঢেলে দিয়েছে। আর তাঁর মতে রং দেওয়া ও রেখা টানার প্রবল ইচ্ছা শিল্পের শৈশব অবস্থার মূল লক্ষণ। আর এই প্রসঙ্গেই তিনি নিয়ে এসেছেন ছেলে ভুলানো ছড়ার কথা। তাঁর মতে এই ছড়ার মধ্যেও যেন শিল্পের সেই প্রথম রূপটি ধরা আছে। অর্থাৎ ছড়ার মধ্যেও রয়েছে রং ও রেখার প্রাচুর্য। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি কয়েকটি ছেলে ভুলানো ছড়া উল্লেখ করে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কথায় — ''যে ছেলে ভুলানো ছড়াগুলো কত কালের তা কে জানে, তার মধ্যেও শিল্পের এই শৈশব অবস্থার রূপটি সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে, যথা —

'এক যে গাছ ছিল
লতায় লতিয়ে গেল
তার এক কুঁড়ি হল।
ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল।'

একটি মাত্র রূপ সে রেখায় লতয় পত্রে পুষ্পে ভরে উঠল। আদিম শিল্পের রঙের হিসেবও এই রূপে ছড়ার মধ্যে ধরা রয়েছে নিখুঁত ভাবে, যথা —

'এপারেতে কালো রং বিষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্,
ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।'

যেন নীলাম্বরী শাড়ির কিনারায় চওড়া রাঙা পাড়ের টানটোন।

'রং নয়তো কাঁচা সোনা,
মুখটি যেন চাঁদের কোণা।!'

কিংবা —

'কে বলেরে আমার গোপাল বোঁচা
সুখসায়রের মাটি এনে নাক করেছি সোজা;
কে বলেরে গোপাল আমার কালো
পাটনা থেকে হলুদ এনে গা করেছি আলো।' ''[৭৭]

এই ছড়ার মধ্যেও রং ও রেখার উপস্থিতি দেখে তাঁর মনে হয়েছে শিল্পের শৈশব রূপটি ছড়ার মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। আবার এই ছড়া যে কবেকার কোন কালের রচনা তারও হদিস মেলে না।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ছড়ার যেমন পদ্যরূপ ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও কোথাও তিনি কাহিনীর প্রয়োজনে নিয়ে এসেছেন ছড়ার গদ্য বর্ণনা। আবার কোনো কোনো স্থানে তিনি এমন কিছু সংলাপ ব্যবহার করেছেন যা খাঁটি ছড়ার মতো মনে হয়। 'বুড়ো আংলা' রচনায় পাখিদের

সংলাপটিকে ছড়ার মতোই লাগে। আমরা সংলাপটি উল্লেখ করব —

'কোন গ্রাম?' 'তেঁতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া, হাল তেঁতুলিয়া।'

'কোন মাঠ?' 'তিরপুরনীর মাঠ জলে থৈ থৈ।'

'কোন ঘাট?' 'সাঁকের ঘাট - গুগলী ভরা।'

'কোন হাট?' 'উলোর হাট - খড়ের ধূম।'

'কোন বাজার?' 'হালতার বাজার - পলতা মেলে।'

'কোন বন্দর?' 'বাগা বন্দর - হুক্কাহুয়া।'

'কোন জেলা?' 'রুরলি জেলা সিঁদুরে মাটি।'

'কোন বিল?' 'চলন বিল - জল নেই।'

'কোন পুকুর?' 'বাঁধা পুকুর - কেবল কাদা।'

'কোন দীঘি?' 'রায় দীঘি - পানায় ঢাকা।'

'কোন খাল?' 'বালির খাল - কেবল চড়া।'

'কোন ঝিল?' 'হীরা ঝিল - তীরে জেলে।'

'কোন পরগনা?' 'পাতলে দ-পাতলাহ।'

'কার বাড়ি?' 'ঠাকুর বাড়ি।'

'কোন ঠাকুর?' 'ওবিন ঠাকুর - ছবি লেখে।'[৭৮]

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় এক বিশেষ দিক হল তাঁর ভাষার ব্যবহার। কখনো তিনি তৎসম সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার পরক্ষণেই সাধারণ কথ্য ভাষায় ফিরে আসছেন। কিন্তু এর জন্য কোথাও সাহিত্যরস বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি। তাঁর 'মারুতির পুঁথি' রচনার এক অংশ সংস্কৃত ভাষার সাথে সাথে কথ্য ভাষার ব্যবহারের নমুনা চোখে পড়ে —

'গন্ধাত্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণ।
অন্ধীভূত কুসুমরজসা কন্টকৈচ্ছিন্ন পক্ষ।।
পদ্মভ্রান্তা ক্ষুধিতমধুপা।
স্থাতুং গন্তুং কমপি নশক্য।'

এরপরেই এসেছে কথ্য ভাষার ব্যবহার —

— 'হাঃ' — বলেই পবন ধুল্যবলুন্ঠিত কলেবর।

— 'গালি দলা বাবা?' — বলেই বুড়ি পবনের হাত চেপে ধরে একটি হাঁক ছাড়লেন - 'গেপ্তার'।[৭৯]

আসলে তিনি মাটির কাছাকাছি থাকতেন, লৌকিক জীবনের প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। যার ফলে তাঁর সাহিত্যে সংস্কৃত তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি লৌকিক কথ্য ভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে। তাঁর 'বুড়ো আংলা' রচনায় রিদয় ও গুগলির কথোপকথনে এই বিষয়টি দেখা যায় —

''রিদয় বললে — 'আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানেই যাইব।'

গুগলীও বললে — 'আমিও যেহ্যনে যাত্রা করি বাইরেচি, এই বেদ্ধোকালে, সেহ্যেনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মুনি।' ''[৮০]

আবার অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষার মধ্য দিয়েই ছবির পর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর গদ্যভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য চিত্রধর্মিতা। তিনি কলমের আঁচড়ে যেনো ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'শকুন্তলা' রচনাংশ থেকে একটু অংশ তুলে ধরা হল —

''এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল-তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড় স্থির আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া - সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেতো গাছের ছায়ায় কতগুলি কুঠিরের ছায়া।''[৮১]

এই ভাবে দেখা যায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কখনো চরিত্রের কথোপকথনে, কখনো গানের মধ্যে আবার অনেক সময় কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিন ছড়ার ব্যবহার করেছেন। তাঁর সাহিত্যে পদ্য ও গদ্য পাশাপাশি সহবস্থান করেছে। তাই দেখি কখনো তিনি ছড়ার পদ্যরূপ ব্যবহার করেছেন, আবার প্রয়োজনে এসেছে ছড়ার গদ্য বর্ণনা। যা কখনো বেমানান মনে হয়নি। তাঁর লোকসাহিত্য প্রীতির কথা বলতে গিয়ে নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন —

'' 'ক্ষীরের পুতুল' এবং 'ভূতপত্‌রির দেশ' — দুটি রচনাতেই দেখা যায় গদ্যের শৈলীতে ছড়ার ভঙ্গির সঙ্গে রূপকথার ভঙ্গির মিশ্রণ ঘটেছে। আগেও বলেছি, এখন পুনরুক্তি করে বলি, এই মিশ্ররীতিই অবনীন্দ্রনাথের রীতি এবং এই রীতি অনুসরণের মধ্যেই তাঁর লোকসাহিত্য চর্চার একটি পরোক্ষ দিক সুপ্ত আছে।''[৮২]

—০—

তথ্যসূত্র

১) দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ২৫৯।

২) ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৪৫-৪৬।

৩) ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভভন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১৭৭।

৪) তদেব, পৃঃ ২১৮।

৫) তদেব, পৃঃ ২১৯।

৬) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৮৬।

৭) ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২১৯-২২০।

৮) তদেব, পৃঃ ২২০-২২১।

৯) তদেব, পৃঃ ২২১।

১০) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

১১) ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

১২) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

১৩) ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২২৪।

১৪) তদেব, পৃঃ ২২৫।

১৫) তদেব, পৃঃ ২২৬।

১৬) তদেব, পৃঃ ২২৬।

১৭) তদেব, পৃঃ ২২৬।

১৮) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৫৪।

১৯) ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২২৭।

২০) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ২০৭।

২১) ভূতপত্রীর দেশ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২২৭।

২২) তদেব, পৃঃ ২২৮।

২৩) খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৮২।

২৪) তদেব, পৃঃ ৮২।

২৫) তদেব, পৃঃ ৮২।

২৬) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ১১৮-১১৯।

২৭) খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৮৭।

২৮) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ১৮৪।

২৯) খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৮৯।

৩০) তদেব, পৃঃ ৯০-৯১।

৩১) দাস আনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ২০।

৩২) খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৯৩।

৩৩) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলা ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৩৭৮।

৩৪) বাদশাহী গল্প, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩১৯।

৩৫) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ২৯৫।

৩৬) চাঁদনি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৩৩৯।

৩৭) দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ২৩।

৩৮) মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৪৬।

৩৯) শিব-সদাগর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২৯৪।

৪০) উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১১।

৪১) দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ৩৪।

৪২) উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২১

৪৩) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৭০।

৪৪) মউর ছালের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৪২।

৪৫) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৫২।

৪৬) মউল ছালের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৪৪।

৪৭) দত্ত ভবতারণ (সংকলতি ও সম্পাদিত) বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৪৪৪।

৪৮) বেণুকুঞ্জের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১১৯।

৪৯) দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ২০।

৫০) ঋষিযাত্রা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।

৫১) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঋ ৪৮১।

৫২) হংসনামা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২০০।

৫৩) দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদিত ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ৬৯।

৫৪) হংসনামা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২০০।

৫৫) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ২৩২।

৫৬) হংসনামা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২০১।

৫৭) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৩১৫।

৫৮) হংসনামা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২০১।

৫৯) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৬৩।

৬০) হংসনামা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২০৩।

৬১) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৩৭।

৬২) বৃক ও মেষপালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২৩৪।

৬৩) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৫৬।

৬৪) জাবালীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২৫৭।

৬৫) ঘোড়াহাটের পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৩৩৯।

৬৬) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৪২।

৬৭) যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ৪।

৬৮) দাস আনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ১৩।

৬৯) যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ১৮।

৭০) দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ৭৩।

৭১) যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ৮৯।

৭২) দাস অনাথনাথ ও রায় বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ৩৭।

৭৩) তদেব, পৃঃ ৮৭।

৭৪) দত্ত ভবতারণ (সংকলিত ও সম্পাদিত) বাংলার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ১৯৮।

৭৫) যাত্রাগানে রামায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ ৩৪২।

৭৬) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী / দৃষ্টি ও সৃষ্টি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ৩৩।

৭৭) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী / শিল্প বৃত্তি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ১৫৮ - ১৫৯।

৭৮) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

৭৯) মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩।

৮০) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

৮১) শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪।

৮২) ভৌমিক নির্মলেন্দু, লোকশিল্প ও সাহিত্য ঃ অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃঃ ২৮।

—০—

লোকক্রীড়া

খেলাধূলা শুধু স্বাস্থ্যের পক্ষেই উপকারী তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে অবসরযাপন ও চিত্তবিনোদনের কাজটিও সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। লোকসমাজে নানা খেলাধূলার প্রচলন দেখা যায়। আবার সময়ের সাথে সাথে অনেক খেলার বিলোপসাধনও ঘটতে দেখা যায়। লোকসমাজে ডাংগুলি, হা-ডু-ডু, লুকোচুরি, ইকড়ি মিকড়ি ইত্যাদি খেলার প্রচলন রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথও তাঁর কোনো কোনো রচনায় এই লোকক্রীড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। আমরা নিম্নে তা আলোচনা করব।

অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' রচনায় দুষ্টু ছেলে রিদয় খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে কৈলাসের পথে যাত্রা করেছে গণেশের কাছে ক্ষমা চেয়ে যক থেকে পুনরায় মানুষ হয়ে ওঠার আশায়। পথে লুসাই হাঁসের ডানায় আঘাত লাগায় হাঁসেরা একস্থানে ডানা ভালো না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বলে স্থির করল। আর রিদয় সেখানে খেলে চলল নানা ধরণের খেলা —

''... তারপর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে নানা রকম খেলা চলল। কোনো দিন দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি, হাঁসের লড়াই — এমনি সারাদিন ছুটোছুটি চেঁচামেচি! ...''[১]

উপরোক্ত অংশে উল্লিখিত লুকোচুরি খেলাটি সমাজে বহুল পরিমানে প্রচলিত। এই খেলার যতখুশি জন অংশগ্রহণ করতে পারে। তার মধ্য থেকে একজন চোর নির্বাচিত হয়। তার কাজ হয় অন্যান্য যারা লুকিয়ে আছে তাদের খুঁজে বের করা। এইভাবে সমস্ত খেলোয়াড়কে তাকে খুঁজে বের করতে হয়। তবে তার মাঝে চোরে অসকর্তা হেতু কেউ যদি তাকে ছুঁয়ে 'ধাপ্পা' দিয়ে যায়, তবে পুনরায় তাকে চোর সেজে খুঁজে বেড়াতে হয়। এইভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

অবনীন্দ্রনাথের 'শিব-সদাগর' নাটিকাতে শিবের সংলাপে হাডুডু খেলার প্রসঙ্গ এসেছে। আমরা তা উল্লেখ করব —

''শিব যাক, সাধু ভাষায় তোমার খুবই দখল জন্মেছে। এখন নতুন পাঠ নাও। ধরো নিজের কান - চেঁচিয়ে বলো —

এক হাত তোতারাম দুই হাত শিং
নাতে তোতারাম তা ধিং ধিং।

— যাও ছেলেরা, বিদ্যালয়ের ছুটি, এখন হাডুডুডু খেলো গিয়ে। আমরা ততক্ষণ একটু ঘরের মধ্যে গিয়ে আরাম করি।''[২]

হাডুডু খেলায় সাধারণত ছেলেরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। এই খেলায় দুটি দল থাকে।

একটি নির্দিষ্ট দাগ কেটে তার দুপাশে দুটি দলের খেলোয়াড়রা থাকে। একদলের কোনো খেলোয়াড় যদি শ্বাস বন্ধ থাকা অবস্থায় 'কবাডি কবাডি' বলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিয়ে নিজের ঘরে আবার ফিরে আসতে পারে তবে সেই ছুঁয়ে ফেলা খেলোয়াড়কে মোড় হিসাবে ধরা হয়। এইভাবে আবার অন্যপক্ষের খেলোয়াড় মোড় হলে আগের মোড় খেলোয়াড়ের খেলাতে অংশ নেওয়ার সুযোগ মেলে। এইভাবে খেলাটি চলতে দেখা যায়।

আবার 'উড়নচণ্ডীর পালা'-তেও কূর্ম এর কথায় এসেছে হাডুডু খেলার কথা। কাক এর সাথে কথোপকথনকালে কূর্ম বলে ওঠে —

''কূর্ম । এ তো একটা সমিস্যে। এর সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে যাব কী? নাঃ তুমি হাসালে। তুমি পরামর্শ করতে চাচ্ছ যাও, কিন্তু গিয়ে দেখবে হয় একটি পাকা বেল, নয় ঝুনো নারকেল। এর চেয়ে জলহস্তীর কাছে গেলে ভাল করতে। সেই গজকচ্ছপের যুদ্ধের সময় দুজনে হাডু-ডু-ডু খেলেছি; এখন কেথায় আছেন, আছেন কি নেই তাও জানিনে — চললে তা হলে?''[৩]

আবার 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের 'খেলার পুতুল' প্রবন্ধে মানুব শিশু সম্পর্কে বলতে গিয়ে একস্থানে লুকোচুরি খেলার রহস্যময়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায় —

''আর এক ছেলে — সে সবে কপচাতে শিখেছে — সমুদ্রতীরে প্রাতঃসূর্যকে দেখে বললে, চাঁদটা কী লাল দেখো।

পশুরাজ সেখানে বেরাল সেজে খেলতে আসে, উদয়াচলের সূর্য আসেন তেজ লুকিয়ে ছদ্মবেশে রং মেখে মন ভোলাতে; নির্ভয় খেলার জগৎ — সেখানে ভয় দিতে এল না বাঘ কিন্তু খেলে যেতে এল, অন্ধকার এল সেখানে লুকোচুরি খেলার রহস্যময় রূপ ধরে খেলতে, ভয় পাওয়াতে নয়, আলো এলে কিন্তু স্বপ্ন ভাঙাতে নয় — ...''[৪]

অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে ছেলেভুলানো ছড়ার সাথে ভাদুলি ব্রতের ছড়ার তুলনা করেছেন। ছেলেভুলানো ছড়া একটি মাত্র ভাব বা দৃশ্য নিয়ে যেমন করে কোনো কিছুর বর্ণনা দেয়, ভাদুলি ব্রতের ছড়া সেভাবে কোনো জিনিসকে আমাদের সামনে তুলে ধরে না। আর এই প্রসঙ্গেই তিনি একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন, যেই ছড়াটি 'ইকড়ি মিকড়ি' বা 'ইকিড় মিকিড়' খেলায় ছেলে-মেয়েদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছড়াটি হল —

কিম্বা যেমন — ইকড়ি মিকড়ি চামচিকড়ি
চামকাটা মজুমদার,

ধেয়ে এল দামুদার,

দামুদার ছুতোরের পো,

হিঙুল গাছে বেঁধে থো।''[৫]

ছেলে-মেয়েরা যখন 'ইকড়ি মিকড়ি' খেলাটি খেলে তখন উপরোক্ত ছড়াটি তারা ব্যবহার করে থাকে।

এই খেলাটি গৃহের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। সবাই গোলাকার ভাবে বসে তাদের হাত দুটি মাটিতে উপুড় করে রেখে তাদের মধ্যে কেউ একজন ছড়াটি বলে চলে। এইভাবে ছড়াটি যার আঙুলে গিয়ে শেষ হয় সেই আঙুলটি মুড়ে রাখতে হয়। একে একে সকলের সমস্ত আঙুল মোড়া হয়ে গেলে হাত মুঠো করে সর্দারের কাছে খেলোয়াড়রা যায়। তারপর তার কাছে গিয়ে হাতের মুঠো তার খুলে দেয়। এইভাবে খেলাটি শেষ হয়ে থাকে।

সমগ্র অবনীন্দ্রসাহিত্যে বহুল পরিমাণে না হলেও কোনো কোনো রচনায় অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ ক্রমে লোকক্রীড়ার ব্যবহার ঘটিয়েছেন।

—০—

তথ্যসূত্র

১) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ১৭৫।

২) শিব-সদাগর, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ২৮৯।

৩) উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ২০।

৪) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী / খেলার পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ৩২৬।

৫) বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৪৪।

—০—

লোকপ্রথা বা লোকাচার বা রীতিনীতি

লোক সমাজে বসবাসকারী মানুষজন তাঁদের জীবনযাত্রায় নানা আচার-আচরণ পালন করে থাকে। সেগুলিই হল লোকাচার। এই লোকাচার মানব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এটি একটি প্রথা, যখন এই প্রথা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় তখনই তা লোকাচারে পরিণত হয়। এই লোকপ্রথা বা লোকাচার বা রীতিনীতি পালন করলে শুভ ফল পাওয়া যায় এমন বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে কাজ করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নানান রচনায় এই লোকাচারের প্রসঙ্গটি ব্যবহার করেছেন। মানত করা এই লোকাচারটি সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। মানত করলে মনের আশা পূর্ণ হয় এমন ধারণা মানুষ পোষণ করে। অবনীন্দ্রনাথের 'নালক' রচনায় এর ব্যবহার দেখা যায়। মোড়লের মেয়ে সুজাতার কোনো ছেলে না হওয়ায় সে মানত করেছিল তার ছেলে হলে বটগাছের তলায় পূর্ণিমাতে পুজো দেবে। লেখকের বর্ণনায় সে কথা পাই —

''মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজা দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। ... সুজাতার ছেলে হয় নি, তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মতো যত্ন করে মানুষ করেছেন। আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক বছর বটতলায় রোজ একটি ঘিয়ের পিদিম দিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভালো করে বটেশ্বরকে পুজো দেবেন।''[১]

আসলে এর কোনো পরীক্ষালব্ধ সত্য থাক বা না থাক, লোকমন তাকে গ্রহণ করে নেয় গভীর বিশ্বাসে।

সমাজে জন্ম সংক্রান্ত নানা লোকাচার এর দেখা মেলে। সেটেরা, আটকৌড়ে, ষষ্ঠী পুজো, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি পালিত হয় জন্মের পর থেকে নানা বয়সে। অবনীন্দ্রনাথ 'খাতাঞ্চির খাতা' রচনাংশে এই লোকাচারগুলি নিপুন ভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রথমে আমরা তাঁর এখানে ব্যবহৃত লোকাচারগুলি তুলে ধরব —

''এমনি ধুমধামে ছদিনের দিন সোনার সেটেরা পুজোটি কোনো গতিকে সেরে নিয়ে একটু গুছিয়ে বসতে না বসতে আটকৌড়ে এসে পড়ল। সোনাতোনকে সেদিন দপ্তরখানার উঠোন দিয়ে দু-চারবার রান্নাবাড়িতে ঢুকতে দেখেই খাতাঞ্চি মশয়া বুঝলেন এবার শুধু আটপন কড়ির উপর দিয়েই যাবে না। তিনি চুপি-চুপি সোনাতোনকে ডেকে শুধোলেন, 'ব্যাপার কি?' ... সোনাতেনা যা-যা বলে

গেল ঠিক ঠিক মিলল। সন্ধ্যার পর রাজ্যের কচি ছেলে এসে কুলো পিটিয়ে খই কড়ি ছড়াছড়ি করে খাতাঞ্চিখানার উঠোন সাদা করে দিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে গেল, 'আটকড়া বাটকড়া আট-দুগুণে ষোলো, খাতাঞ্চির দাড়ি ধরে ঝোলো।' ... একমাস পরে ষষ্ঠী পুজো, ঘটে একটু সিঁদুর ডাব আর আম পাতা দিয়ে খাতাঞ্চিমশায় সেরে দিলেন। তখন সোনার মা বললেন, 'সোনার কর্ণবেধে যদি ধুম না করি তো কী বলেছি।' ... তিনি বললেন, 'তা তোমার যখন ইচ্ছে তখন তাই হবে। এখন একটু বুঝে-সুঝে চল, সাত মাসে মেয়ের অন্নপ্রাশনটা দিতে হবে তো আমায়! অন্নপ্রাশন এল, সেটা ষষ্ঠীমার্কণ্ডের পুজো নমো-নমো করে সেরে দিয়ে, খাতাঞ্চিমশায় ছ-মাসের হিসেব নিকেশ লিখতে বসলেন। কিন্তু ষষ্ঠীমার্কণ্ড দুজনে সোনার অন্নপ্রাশনের নৈবিদ্যি খেয়ে এমনি খুশি হয়েছিলেন যে, সোনা দুই বছরে পড়তেই খাতাঞ্চির ঘরে একেবারে মউরে চড়ে জোড়া কার্তিক এসে উপস্থিত। সোনার মা দুই ছেলের নাম দিনের আঙুটি পাঙুটি, আর এক খরচে দুই ছেলের সেটেরা থেকে পৈতে এমন কি বিয়ে পর্যন্ত চলে যাবে জেনে, খাতাঞ্চিমশায় একবার বরং খুশি হয়ে ভুলে সোনাতোনকে ডবল পয়সা দিয়ে ফেললেন।''[২]

অবনীন্দ্রনাথ এখানে যে সকল লোকাচারের প্রসঙ্গ আনলেন সেগুলির সম্পর্কে আমরা নিম্ন সংক্ষেপে আলোকপাত করবো —

ক) সেটেরা ঃ

নবজাতকের জন্ম থেকে ছয় দিনের মাথায় রাত্রিতে এই লোকাচারটি পালিত হয়ে থাকে। বিধাতা পুরুষ এদিন সন্তানের কপালে ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যান বলে মনে করা হয়।

খ) আটকৌড়ে ঃ

জন্মের অষ্টম দিনে এই লোকাচারটি পালন করা হয়। বাড়ির পাশাপাশি ছেলে মেয়েদের এই অনুষ্ঠানে আহ্বান করা হয়। তারা আটকড়াই ভাজা খেয়ে কুলো পিটিয়ে খই ছড়িয়ে ছড়া কাটতে কাটতে নবজাতকের মঙ্গল কামনা করে। আলোচ্য রচনাংশেও খাতাঞ্চিমশায় তার সন্তানের মঙ্গল কামনায় 'আটকৌড়ে' লোকাচারটির পালন করেছিলেন।

গ) ষষ্ঠী পূজা ঃ

সন্তানের মঙ্গল কামনায় মাসান্তে ষষ্ঠী পুজো করা হয়ে থাকে।

ঘ) কর্ণবেধ ঃ

শিশুর পাঁচ বছর বয়সে 'কর্ণবেধ' লোকাচারটি পালিত হয়। কুলের কাঁটা বা সূচ দিয়ে কান ফোঁড়া হয়ে থাকে।

ঙ) অন্নপ্রাশন ঃ

সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত লোকাচারের মধ্যে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। এই লোকাচারটিও সন্তানের মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই দিনই শিশুর মুখে শক্ত খাবার তুলে দেওয়া হয়। শিশুকে এই খাদ্য তার মামাই খাওয়ায়। এটি মুখে ভাত নামেও পরিচিত। এই অনুষ্ঠানে পরিবার-আত্মীয়স্বজন সকলেই আনন্দে মেতে উঠে। সাধারণত মেয়ের থেকে ছেলেদের অন্নপ্রাশনে জাঁকজমক চোখে পড়ে। সাধারণত ছেলের যুগ্ম মাসে ও মেয়েদের অযুগ্ম মাসে অন্নপ্রাশন পালিত হয়। আলোচ্য রচনাংশেও খাতাখিঞ্চশায় তাঁর মেয়ে সোনার সাত মাসে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি পালন করবে বলে তার স্ত্রীকে জানায়।

শিশুর পাঁচ বছর বয়স হলে তার হাতে খড়ি দেওয়া হয়। সরস্বতী পুজোর দিন ব্রাহ্মণ ঠাকুরের উপস্থিতিতে কালো শ্লেটে শিশুর অক্ষর লেখানোর মধ্য গিয়ে এই লোকাচারটি পালিত হয়ে থাকে। অবনীন্দ্রনাথের 'মাসি' গল্পে এসেছে এই লোকাচারটির কথা। যেখানে মাসি এক ভালোদিন দেখে অবুর হাতে খড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা চাঁইবুড়োকে করতে বলার জন্য অবুকে তার কাছে পাঠায়। মাসি বলে — ''তবে চাঁইবুড়োকে বল্ গা একটা ভালো দিন দেখতে। তোর হাতে খড়ি দিতে হবে।''[৩]

এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়েই শিশুর জীবনে প্রথম শিক্ষারম্ভ শুরু হয়।

আবার 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' রচনায় নানান লোকাচারের দেখা মেলে। বিরাশি বুড়ি নিকষাকে ছেলে-পুলে নিয়ে আসতে দেখে তাদের অন্নপ্রাশন কবে দেবে তা জিজ্ঞাসা করে। এটি জন্মের ছয় বা আট মাসে ছেলেদের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের বেলায় সাত বা নয় মাসে পালিত হয়ে থাকে। অংশটি তোলা যেতে পারে —

'' 'ওলো ও নিকষি, এদের অন্নপ্রাশন দিবিনি?' — 'কেন দেব না সাঁই মা, কিন্তু আমার বামুন যে পেলিয়েচে। কে-বা খোলা কাটে, কে-বা হবিষ্যি চড়ায়, কে-বা পত্তর নিয়ে যায় বেম্মোলোকে, জানো তো সব, যে সে মতে মামা-ভাত অন্নপ্রাশন তো চলে না।' ''[৪]

কন্যাদান হল বিবাহ সংক্রান্ত একটি লোকাচার। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ — তিন দাদার বিয়ে হয়ে গেলে, সূর্পণখা মামাকে গিয়ে ধরে ছেলে খুঁজে এনে তার বিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই সময় সূর্পণখার মামা জানায় — '' - 'তোমার বাপ বোম্মোর্ষি তো পালিয়েছে — কন্যাদান করবে কে?

— 'কেন তুমি?'

— 'তা কি হয়! আমি মামা-ভাত দিয়ে ঢুকেছি। কন্যাদান করা আমার কর্ম নয়।'

— 'কন্যাদান করা কি ভারি শক্ত?'

— 'নিশ্চয় — '

দিতে হয় কন্যাটি সালাংকারা, ভরি দরে যাচাই, তদুপরি আছে দান সামগ্রী, বাসন-কোসন, খাট পালং, আর্সি তিন পাট্, আরো কত কী সুট্-সাট, শুধু কি তাই!

নজরানা বরের হীরার আংটি, বডি, বেস্‌লেট, সেপ্‌টিপিন, এসেন, সাবানটি, 'ছোড়দি-প্যারী' মার্কা মারা — টাকা পয়সার মুক্ত ধারা-বইয়ে দেওয়া চাই এত অর্থ সামর্থ্য মামার তোমার তো নাই।''[৫]

কন্যাদন বা কন্যা সম্প্রদান পিতা করে থাকেন। তার সাথে সাথে নানান দান-সামগ্রীও জামাইকে দেওয়া হয়। আর মামা মুখে ভাত দিলেও পিতার উপস্থিতিতে কন্যাদান করতে পারে না। এই কথাগুলিই আলোচ্য অংশে সূর্পণখার মামা কালনেমি সূর্পণখাকে বলেছে।

সূর্পণখার বিয়ের আসরে সূর্পণখার দাঁত খিঁচুনি দেখে সকল পাত্র পালিয়ে গেলে অবশেষে খড়ের বড়ো ভাই তোরঙ্গ এর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেয়। তারপর —

''খড়ের বড় ভাই,
ইস্তিবিল মতে সাদি করল তারে সূর্পণখাই।
বাসরের রাতে, খড়ের গাদাতে,
ঝগড়া তুরঙ্গে আর সূর্পণখাতে —
রাত ফুরাতে দেখা গেল তুরঙ্গ দানব নাই —
পড়ে আছে নাল্ বাঁধা খুর কটাই।
বাসি বিয়েতে শেষ রাতে খর কাঁদে —
'ওরে দোষণ, শোন্ রে শোন্
বৌ করে দাদা ভোজন
দেখবা জাবর কাটতে আছে
খুর ছাড়া কিছু আর বাকি নাই!
সরে পড়, সরে পড়,
বৌভাতে কে জানে খায় কাকে
পালাই চল পঞ্চবটী বন।' ''[৬]

বাসি বিয়ে একটি বিবাহ সংক্রান্ত লোকাচার। এই লোকাচারটি বিয়ের পরের দিন পালিত হয়। কখনো কনের বাড়িতে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে পাত্রের বাড়িতেও বাসি বিয়ের অনুষ্ঠানটি পালন

করা হয়। তারপর ছাদনাতলার একপাশে গর্ত খুলে জল দিয়ে নকল পুকুর তৈরী করা হয়। সেই জলে বরের লুকানো আংটি বধুকে, আবার বধুর লুকানো আংটি বরকে খুঁজে বের করতে হয়। এইভাবে লোকাচারটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পরবর্তী অধ্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যের চিত্রধর্মীতায় লোকয়ত চেতনা কীভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করা হবে।

—০—

তথ্যসূত্র

১) নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৫৪।

২) খাতাঞ্চির খাতা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৮২-৮৪।

৩) মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ১৪৭।

৪) চাঁইবুড়োর পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ১০৮।

৫) তদেব, পৃঃ ১১১-১১২।

৬) তদেব, পৃঃ ১১৪।

—০—